সম্পাদকীয় ঃ

# মাহে রমযান বয়ে আনুক অনেক অনেক কল্যাণ ও বরকত

বরকত ও কল্যানমন্ডিত মাস পবিত্র মাহে রমযান শুরু হচ্ছে। সময়ের আবর্তনে মহান সাধনাপূর্ণ ব্রত পালনের ঐশী নির্দেশ নিয়ে আবারও সমাগত হলো এ পবিত্র মাস। বিগত দিনগুলোর দোষ-ত্রুটি ঢেকে দেয়ার মাস এই রমযান। এ মাস মু'মিনদেরকে ইবাদত বন্দেগীতে, দান-খয়রাতে, পবিত্র কুরআন পাঠে অধিকতর মনোনিবেশ করার সুযোগ এনে দেয়। আর এই পবিত্র মাহে রমযানেই মহান খোদা তাআলা তাঁর বান্দাদের দোষত্রুটি ক্ষমার দুয়ার অবারিত করে দেন এবং তাঁর নৈকট্য লাভের এক বিরাট সুযোগ করে দেন। রমযানের এমনই গুরুত্ব যে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় নৈকট্য দানের উদ্দেশ্যেই যেন এই রোযা প্রবর্তন করেছেন আর এর ফলে মু'মিন তার প্রতিটি পুণ্যকে সর্বোচ্চ মার্গে পৌঁছাতে পারে। খোদা তাআলার সান্নিধ্য লাভ পবিত্র মাহে রমযানের মূল উদ্দেশ্য কেননা রোযাদারের পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা।

এ মাসে খোদা তাআলার মু'মিন বান্দা ইবাদতে, নামাযে, কুরআন পাঠে, দান-খয়রাতে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার সত্তাকে অর্জনের জন্য তাঁরই আদেশে পানাহার ও দৈনন্দিন জীবনাচার পালন করার জন্য একটি মাস নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এভাবে তার একনিষ্ঠ এ আমল আল্লাহ্ তাআলার রহমত আকর্ষণ করে এতে তিনি খুবই খুশী হন। মহা নবী (সা.) বলেছেন, পথ ভ্রষ্টরা যখন পথ খুঁজে পায় আল্লাহ্ তখন খুশী হন। কোন মা যেমন তার হারানো সন্তানকে ফিরে পেয়ে খুশী হয়, তার চেয়েও বেশী খুশী হন তিনি।

এই রমযান মাসে মহান খোদা তাআলা তাঁর রহমতের সকল দুয়ার খুলে দেন যাতে বান্দারা বেশী বেশী কল্যাণ লাভ করতে পারে। রসূল করীম (সা.) বলেছেন, রমযান মাস যখন আসে বেহেশ্তের দরজাসমূহ তখন খুলে দেয়া হয় এবং দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়। আর শয়তানকেও করা হয় শৃংখলিত।

তাই, মহান এই মাসে ইবাদত বন্দেগী করার সুবর্ণ এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জীবনের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করা উচিত।

৩১ আগষ্ট ২০০৮

*সূচী পত্র* — *পৃষ্ঠা নং*


- **কুরআন শরীফ** ৪
- **হাদীস শরীফ** ৫
- **অমৃত বাণী** ৬
- ***জুমুআর খুতবা ঃ*** ৭-১৩
  *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)*
- **কুরআন আমার প্রিয় কুরআন** ১৪-১৮
  আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান
- **প্রসঙ্গ ঃ রোযা**
  মাহমুদ আহমদ সুমন ১৯-২৩
- **সফর এবং অসুস্থতায় রোযা পালন সম্পর্কিত নির্দেশনা** ২৪-২৫
  সংকলন ঃ মাওলানা রইস আহমদ
- ইসলামে পবিত্র রমযানের গুরুত্ব ২৬-২৮
  লাকী আহমেদ
- জ্ঞান জিজ্ঞাসা ২৯-৩১
- **তবলীগি সার্কুলার** ৩২-৩৩
- **সংবাদ** ৩৪-৩৮



**প্রচ্ছদ ডিজাইন : তারেক আহমদ (সবুজ)**


এই পবিত্র মাসেই পবিত্র কুরআন শরীফ নাযিল হয়েছে। তাই এ মাসে কুরআন পড়া, পড়ানো, শুনা ও শুনানোর বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের সৌভাগ্য যে, মহান খোদা তাআলা আবারো আমাদেরকে এই পবিত্র মাস, বরকতের মাস পাবার সৌভাগ্য দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। তাই এই মাসের যথাযথ মূল্যায়ণে আমাদের সাধনারত থাকতে হবে । মহান খোদার কাছে শুকরিয়া আদায় করে এই মাসে বেশী বেশী নফল ইবাদত, দান-খয়রাত, কুরআন পাঠ, কুরআনের দরস শুনা ইত্যাদি নেক আমলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, যাতে মহান সেই সত্তার করুণাবারি লাভ করে আমরা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারি।

হে খোদা! তুমি আমাদেরকে এই পবিত্র মাসের বরকত থেকে বরকতমন্ডিত করো এবং তোমার রহমতের ছায়ায় আচ্ছাদিত করে রাখো, আমীন!

# কুরআন শরীফ
# সূরা বাকারা-২

১৮৪। হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের ওপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হলো, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের[২০৬] ওপর তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করতে পার।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡکُمُ الصِّيَامُ کَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِکُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ

১৮৫। (ফরয রোযা) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তাহলে তাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে; এবং যাদের পক্ষে এ (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত,[২০৭] তাদের ওপর ফিদিয়া – এক মিসকীনকে খাবার দান করা। অতএব, যে কেউ স্বেচ্ছায় পুণ্যকর্ম করবে, তা অবশ্য তার জন্য উত্তম হবে। বস্তুতঃ তোমরা যদি জ্ঞান রাখ তা হলে জেনে রাখ, তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণ কর।

اَيَّامًا مَّعۡدُوۡدٰتٍ ؕ فَمَنۡ كَانَ مِنۡكُمۡ مَّرِيۡضًا اَوۡ عَلٰى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيۡنَ يُطِيۡقُوۡنَهٗ
فِدۡيَةٌ طَعَامُ مِسۡكِيۡنٍ ؕ فَمَنۡ تَطَوَّعَ خَيۡرًا فَهُوَ خَيۡرٌ
لَّهٗ ؕ وَاَنۡ تَصُوۡمُوۡا خَيۡرٌ لَّـكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

---

২০৬। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে রোযা (উপবাস-ব্রত) পালন কোন না কোন আকারে সকল ধর্মেই পাওয়া যায়। "অধিকাংশ ধর্মগুলোতে এবং নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর কৃষ্টির মধ্যে, উপবাস ব্রত একটি সাধারণ ভাবে নির্দেশিত ব্যাপার। আর যেখানে এই ধরণের নির্দেশ নাই, সেখানেও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাকিদে অনেকেই উপবাস করে থাকেন" (এনসাই-বৃট)। সাধুপুরুষ দিব্যজ্ঞানীগণের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনের পবিত্রতা সাধনের জন্য শারীরিক সম্পর্ক সমূহ কিছুটা ছিন্ন করা এবং সাংসারিক বন্ধন থেকে কতকটা মুক্তিলাভ একান্তই প্রয়োজন। তবে, ইসলাম এই উপবাস ব্রতের মধ্যে নবরূপ, নব অর্থ ও নবতম আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করেছে। ইসলাম রোযাকে (উপবাস পালন) পূণ্যমাত্রার আত্মোৎসর্গ স্বরূপ মনে করে থাকে। এটা আত্মবলিদানের প্রতীক। যিনি রোযা পালন করেন, তিনি যে কেবল শরীর রক্ষাকারী খাদ্য-পানীয় থেকেই বিরত থাকেন তেমন নয়, বরং সন্তানাদি জন্মদান তথা বংশবৃদ্ধির ক্রিয়াকলাপ থেকেও দূরে থাকেন। অতএব, যিনি রোযা রাখেন, সে তার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দেয় যে, প্রয়োজন বোধে, তার প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার খাতিরে সে তার সবকিছু, এমনকি তার জীবন পর্যন্ত কুরবানী করে দিতে সামান্যও কুণ্ঠিত নয়।

২০৭। 'ইয়ুতিকুনাহু'র অর্থ করা হয়েছে, যাদের পক্ষে এটা ক্ষমতাতীত বা যারা অতি কষ্টে তা (রোযা) করতে পারে। অন্য পাঠ 'ইয়ুতাঈকুনাহু' এই অর্থকে সমর্থন করে (জরীর)। এ আয়াতে তিন শ্রেণীর বিশ্বাসীকে রোযার ব্যাপারে কিছুটা রেহাই বা সুবিধা দেয়া হয়েছে–অসুস্থ, ভ্রমণরত এবং অতি দূর্বলদেরকে। 'ইয়ুতিকুনাহু'র অর্থ এখানে "যারা রোযা রাখতে অসমর্থ" হতে পারে (লিসান ও মুফরাদাত)। সমস্ত বাক্যটির অর্থ এমনও করা হয়েছে, "রোযা রাখা ছাড়াও, অতিরিক্ত পুণ্য অর্জনের জন্য সামর্থবান ও অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ" গরীবদেরকে খাওয়াতে পারেন। সেক্ষেত্রে 'ইয়ুতিকুনাহু'র 'হু' সর্বনামটি একজন গরীবকে "খাওয়ানোর" পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে।

# হাদীস শরীফ
# রোযা

**হাদীস ঃ**

হযরত আবু আয়্যুব আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে এবং পরবর্তীতে (ঈদের দিন বাদ দিয়ে) শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখে সেক্ষেত্রে সে যেন গোটা বছরই রোযা রাখলো (মুসলিম)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও পূর্ণাঙ্গীন শর্তাবলীসহকারে রমযানের রোযা রাখে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।

**ব্যাখ্যা ঃ**

রমযান একটি পবিত্র মাস। এ মাসের ইবাদত খোদার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। কারণ নামায ও রোযার সমন্বয় মানুষের মাঝে খোদার নৈকট্য লাভের এক আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়। তা এভাবে যে, নামায আত্মাকে পবিত্র করে এবং রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে। ফলশ্রুতিতে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি রোযা দ্বারা আধ্যাত্মিকতার এক নতুন রাস্তায় পরিচালিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টির ছায়াতলে চলে আসে। কুরআন বলে, রোযা তোমাদের মাঝে তাক্ওয়া অর্থাৎ খোদা-ভীতি সৃষ্টি করবে। এই তাক্ওয়া কিভাবে সৃষ্টি হবে? বস্তুতঃ রোযা এমন এক ইবাদত যা মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ না রেখে কেউ রোযা রাখে তবে তা রোযা নয় বরং অন্য কিছু। খোদা-ভীতির সৃষ্টি এভাবেই হয় যে, মানুষ খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের মন-মেজাজ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খোদার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়। ফলে ধীরে ধীরে তার অবাধ্য আত্মা নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে এবং ঐ সকল কর্ম হতে সে দূরে সরে পরে যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

হযরত রসূল করীম (সা.) শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযার কথা উল্লেখ করে এর গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন যে, রমযানের ৩০ টি ও শাওয়ালের ৬টি মোট ৩৬ টি রোযা যে রাখবে সে যেন সারাটা বছর রোযা রাখার সওয়াব পেল। এক হাদীসে আছে, এক রোযার দশটি সওয়াব। এভাবে ৩৬X ১০ মোট ৩৬০ হয় অর্থাৎ ৩৬০ দিন রোযা। অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ পূর্ণ শর্তাবলীর সাথে রোযা পালন করে তবে তার পূর্বেকার সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এর অর্থ হলো, রমযান তাক্ওয়ার সৃষ্টি করে থাকে। যদি কেউ রোযা পালনের মাধ্যমে এ তাক্ওয়া নিজের মাঝে সৃষ্টি করে নেয় ও তওবাতুন নাসূহ্ করে (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গীন তওবা দ্বারা নিজের সংশোধন করে নেয় আর কখনও পাপের দিকে ফিরে না তাকায়) , তাহলে এমন ব্যক্তির প্রতি খোদা দয়া পরবশ হয়ে তার গুনাহ্ মাফ করে দেন। রোযার মাস সংযমের মাস, সাধনার মাস।

আসুন এই রমযানে আমরা চেষ্টা করি, সাধনা করি, যেন আমাদের অবাধ্য আত্মা অর্থাৎ ‘নফসে আম্মারা’ প্রশান্তি প্রাপ্ত আত্মাতে অর্থাৎ ‘নফসে মুতমাইন্না’তে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে পবিত্র রমযান মাসে এ সাধনা করার তৌফিক দিন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

**আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ**

মুরব্বী সিলসিলাহ্

# অমৃতবাণী
# হযরত ইমাম মাহদী (আ.)
# রোযার মাহাত্ম্য

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রোযার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখেছেন, "অল্প আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করাও আত্ম শুদ্ধির জন্য আবশ্যক। এতে দিব্য-দর্শন শক্তি (কাশ্‌ফী তাক্‌ত) বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু খাদ্য গ্রহণ করে বাঁচে না। যে অনন্ত জীবনের প্রতি লক্ষ্য করা একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে নিজের ওপর "ঐশী ক্রোধ" (কহরে ইলাহী) আনয়ন করে। কিন্তু রোযাদারকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে রোযার অর্থ শুধু এটাই নয় যে, মানুষ অনাহারে থাকবে; বরং খোদার যিক্‌র অর্থাৎ তাঁর স্মরণে মশগুল থাকা উচিত। আঁ হযরত (সা.) রমযান শরীফে অনেক বেশী ইবাদত করতেন। এই দিনগুলোতে পানাহারের চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ করা চাই। দুর্ভাগ্য ঐ ব্যক্তির, যে দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্য পরওয়া করে না। বাহ্যিক খাদ্য দ্বারা দৈহিক শক্তি লাভ হয়, একই ভাবে আধ্যাত্মিক খাদ্য আত্মাকে কায়েম রাখে এবং তদ্দারা আত্মার শক্তিগুলো সতেজ হয়। খোদার কাছে সাফল্য চাও। কারণ, তিনি সামর্থ্য দিলেই সকল দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে।"

"কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নয় বরং এর একটি তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে যা অভিজ্ঞতার দ্বারা বোঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এটা নিহিত আছে যে, মানুষ যত কম খায়, ততই তার আত্মশুদ্ধি এবং দিব্য-দর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়। খোদার অভিপ্রায় এটাই যে, একটি খাদ্যকে কম করে অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। রোযাদারের সর্বদাই এর প্রতি দৃষ্ট দেয়া কর্তব্য। খোদা তাআলার যিক্‌র বা স্মরণের মধ্যেই সময় কাটানো উচিত যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব, রোযার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে যা আত্মার প্রশান্তির এবং তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু খোদার জন্যই রোযা রাখে এবং আচার-অনুষ্ঠানের রোযা রাখে না, তার উচিত, সে যেন সর্বদা হাম্‌দ (প্রশংসা কীর্তন), তাসবীহ্ (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা মাহাত্ম্য ঘোষণা) এবং তাহলীলের (আল্লাহ্‌র তৌহীদ ঘোষণা) মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাতে তার দ্বিতীয় খাদ্যের (আধ্যাত্মিক খাদ্যের) সৌভাগ্য লাভ হয়" (আল হাকাম, ১৭-১-১৯০৭)।

"সর্বদা রোযাদারের এ কথা দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, ক্ষুধার্ত থাকাই তার উদ্দেশ্য নয়। বরং তার উচিত সে খোদা তাআলার যিক্‌র-এ মগ্ন থাকবে যাতে দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহ্ মুখী হওয়া যায়। অতএব রোযার উদ্দেশ্য এটাই যে, মানুষ একটি রুটি ছেড়ে দিয়ে যা কেবল দেহ প্রতিপালন করে দ্বিতীয় রুটি লাভ করে যা আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ। যারা কেবল খোদার জন্য রোযা রাখে, তাদের উচিত আল্লাহ্ তাআলার 'হাম্‌দ' (প্রশংসা), 'তস্‌বীহ্' (গুণকীর্তন করা) ও 'তাহলীল' (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) পাঠে মগ্ন থাকা, যদ্দরুন অন্য খাদ্যও তারা পেয়ে যায়" (মলফুযাত, ৯ম খন্ড, পৃঃ ১২৩)।

# যারা নিজেরা তাক্‌ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে চেষ্টা করে, তাদেরকেই আল্লাহ্ তাআলা তাক্‌ওয়ার পথে চলার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ্ তাআলা রমযানের রোযাকে তাক্‌ওয়া অর্জনের একটি বড় মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছেন।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

*[সৈয়্যদেনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭ ইং মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্ লন্ডনে প্রদত্ত]*

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ

عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

(সূরা বাকারা ঃ ১৮৪)

অর্থাৎ **"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য রোযাকে সেভাবেই ফরজ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বণ কর।"**

এটা হচ্ছে রোযার ফযিলত সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাআলার হেদায়াত ও হুকুম। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ফজলে এ বছর পুনরায় আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছন যে, তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য যে সব উত্তম ব্যবস্থা দান করেছেন, আমরা সেগুলোর শামিল হচ্ছি। গণণার এ কয়েকটি দিন, যা কাল হতে শুরু হয়েছে, সেগুলো অতিবাহিত করছি। কাজেই, আল্লাহ্ তাআলার আদেশ অনুযায়ী, আমরা যদি তাক্‌ওয়ার পথে উন্নতি করতে চাই, আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য পেতে চাই, নিজেদের দোয়া সমূহকে কবুলিয়্যতের মর্যাদায় পৌঁছাতে চাই এবং নিজেদের ধর্মীয়, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি করতে চাই, তবে প্রত্যেক আহমদীর এ দিনগুলো হতে লাভবান হওয়ার জন্য সর্বাধিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এই যে রোযা, যা তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে, এটা রূহানী (আধ্যাত্মিক) উন্নতি ও তাক্‌ওয়ার পথে অগ্রগামী হওয়ার জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। পূর্বেও নবীগণের মান্যকারীদের রূহানী (আধ্যত্মিক) উন্নতির জন্য, তাদের হৃদয়ের পবিত্রতার জন্য ও তাদেরকে খোদা তাআলার নৈকট্য দান করার জন্য, পৃথিবীতে একে ফরজ করা হয়েছিল। সুতরাং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ। এর উপর প্রতিষ্ঠিত (পা-বন্দি) থাকা-ই আমাদের তাক্‌ওয়ার মানকে উন্নতি দানকারী বানাবে। পূর্ববর্তী নবীগনের মান্যকারীদের মধ্যে থেকে যারা কোন ওজর-আপত্তি না দেখিয়ে খোদা

তাআলার আদেশ সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত (পা-বন্দি) ছিলেন, তারাও আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ করেছিলেন এবং তাঁর কল্যাণরাজির ওয়ারিশ হয়েছিলেন। খোদা তাআলা যখনই তাঁর হুকুম-আহকাম কোন নবীর নিকট প্রেরণ করেছেন, যখনই দুনিয়ার সংশোধনের জন্য খোদা তাআলা তাঁর রসূল প্রেরণ করেছেন, তখন ঐ সকল লোকেরা-ই আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জনকারী ও তাঁর হুকুম-আহকামের অংশীদার হয়েছেন, যারা সেই রসূলের পরিপূর্ণ অনুগত ও তাবেদার হয়ে ঐ শিক্ষার উপর আমল করেছেন এবং ঐ হুকুম-আহকামের উপর চলেছেন, যা আল্লাহ্ তাদের উপর অবতীর্ণ করেছিলেন আর তারা তাদের তাক্ওয়ার মানকে উন্নীত করেছেন। যখন অস্বীকারকারী হয়েছে তখন, যেখানে আধ্যাত্মিক অবস্থার পতন ঘটেছে, সেখানে দুনিয়াবীভাবেও শান-শওকত (জৌলুস) হারিয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে এর উল্লেখও করেছেন। কাজেই, আল্লাহ্ তাআলা যখন নবীগণের মান্যকারীদের তাক্ওয়ার পথে চলার তাকিদ করেন, তখন এটাও বলেন, তোমরা তাক্ওয়ার সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে, দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামত সমূহের অংশীদার হও, তাঁর জান্নাতে ওয়ারিশ হও, যেভাবে তিনি বলেন,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٰنِ

(আর রহমান ঃ ৪৭)

অর্থাৎ, **"যে ব্যক্তি-ই তার প্রভু-প্রতিপালকের শান বা মর্যাদাকে ভয় পায় তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে।"**

আল্লাহ্ তা্আলার তাক্ওয়া অবলম্বন করা অবস্থায়, তাঁর মর্যাদাকে উপলব্ধি কর, যে তিনি-ই সকল ক্ষমতার মালিক। তোমাদের হৃদয়ে সবচেয়ে বেশি তাঁর-ই ভয় থাকা উচিত। অতঃপর এ দুনিয়াতেও তাঁর জান্নাতের অংশীদার হবে এবং পরকালের জীবনেও তাঁর নেয়ামতসমূহ ও জান্নাতের ওয়ারিশ বলে বিবেচিত হবে।

কাজেই প্রত্যেক আহমদী মুসলমানকে তাক্ওয়ার পথে অগ্রগামী হওয়ার জন্য এবং আল্লাহ্ তাআলার জান্নাতের ওয়ারিশ হওয়ার জন্য, আল্লাহ্ তাআলার মর্যাদা উপলব্ধি করা খুব জরুরী। এ উপলব্ধি তখনই হবে, যখন আল্লাহ্ তাআলার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর হুকুম-আহকামের উপর আমল করবে। সেই হুকুম-আহকামগুলোর মধ্যে থেকে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে রমযান মাসে রোযা রাখার একটি হুকুম দিয়েছেন। আমরা সৌভাগ্যবান, কেননা আমরা এমন একটি কিতাবের মান্যকারী, যা সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ কিতাব, আমরা ঐ কিতাবের মান্যকারী, যার মাঝে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নেয়ামতসমূহের পূর্ণতা দানের ঘোষণা দিয়েছেন। আমরা এইজন্য সৌভাগ্যবান যে, আমরা সেই শরিয়তের মান্যকারী, আল্লাহ্ তাআলা যাকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখার অঙ্গীকার করেছেন। আমরা এইজন্য সৌভাগ্যবান যে, আমরা সেই আখেরী শরিয়তবাহী নবী (সা.)-এর মান্যকারী, যাঁকে আল্লাহ্ তাআলা খাতামুল আম্বিয়া বলে সকল নবী ও রসূলগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পূর্বের রসূলগণ তো নিজ নিজ জাতিকে তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ঐ জাতিসমূহের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলার হুকুম-আহকাম নিয়ে আসতেন কিন্তু কুরআন করীম সারা দুনিয়ার সকল জাতির ও সকল যুগের সংশোধনের হুকুম আহকাম নিয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি (সা.) তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এমন হুকুম-আহকাম নিয়ে এসেছেন, যা আজও, সকল জাতি ও এ যুগের জন্য জীবন্ত এবং পরবর্তীতেও জীবন্ত থাকবে। সুতরাং আমাদের ভাবা উচিত যে, এ বিষয় সমূহ অর্থাৎ অবতীর্ণ এ হুকুম-আহকামসমূহ আমাদের কাছে কি চায় এবং আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন ও যে অনুগ্রহ (এহসান) করেছেন, তা আমাদের কাছে কি চায়? এগুলো তাগিদ দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ তাআলা এই আখেরী শরীয়তবাহী কিতাবে যেসকল নেয়ামতের পূর্ণতার উল্লেখ করেছেন, আমরা যেন সেগুলো অর্জনের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করি। এগুলো আমাদেরকে তাকিদ দিচ্ছে, আমরা যেন আল্লাহ্ ও এই রসূল (সা.)-এর হুকুম-আহকামের উপর আমল করার জন্য আমাদের সমস্ত ক্ষমতাকে কাজে লাগাই, আমরা যেন সেই চেষ্টা-প্রচেষ্টা করি, যেটা করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূল (সা.) আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন, আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(আন কাবুত ঃ ৭০)

অর্থাৎ **"এবং যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে, অবশ্যই আমরা তাদেরকে আমাদের পথে আসার তৌফিক দান করবো।"**

কাজেই আল্লাহ্ তাআলার সাথে সাক্ষাতের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা জরুরী। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে-ই তাঁর পথে আসার জন্য দিক-নির্দেশনা দান করেন, যারা একনিষ্ঠভাবে তার দিকে আসার জন্য চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে-ই তাকওয়ার পথে চলার তৌফিক দান করেন, যারা নিজেরাও তাকওয়ার পথে চলার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের দিকেই দৌড়ে আসেন, তাঁর দিকে যারা কমপক্ষে হেঁটে আসার চেষ্টা করেন। তাক্ওয়া অর্জনের জন্য এবং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যেসব চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে রয়েছে সেগুলোর মধ্যে রমযানের রোযা রাখাকে আল্লাহ্ তাআলা একটি বড় ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার কল্যাণসমূহ ও তাঁর নেয়ামতসমূহ লাভের জন্য, যে ব্যক্তি প্রকৃত চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে তাকে গুনা থেকে পবিত্র করা হয়, সে নেকী করার তৌফিক পায় এবং সে আল্লাহ্ তাআলার কল্যাণসমূহ লাভ করে থাকে।

এক রেওয়ায়েতে এসেছে, হাদীসে রয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে বান্দা আল্লাহ্ তাআলার পথে তাঁর কল্যাণপ্রার্থী হয়ে রোযা রাখে, আল্লাহ্ তাআলা তার মুখমন্ডল ও আগুনের মাঝে সত্তর খারীফ দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবেন। (বুখারী কিতাবুল জিহাদ ও সেয়র)

অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল হতে শীতকালের মাঝে যতটা ব্যবধান এর চেয়ে সত্তরগুণ বেশি ব্যবধান সৃষ্টি করে দেয়। এটা একটা উপমা যে, তার থেকে আগুন এত দূর সরিয়ে দেয়।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার পথে তাঁর ফযল প্রার্থী হয়ে রোযা রাখা জরুরী, যেভাবে তিনি আদেশ দিয়েছেন। কোন ধরনের দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে যেন (এ রোযা) না হয় বরং শুধু মাত্র তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয়, আর যদি এমন হয় তবে আল্লাহ্ তাআলা (মুযাহেদাকারী) চেষ্টা-প্রচেষ্টাকারীকে শুধু আগুন হতেই বাঁচান না বরং তাঁর সন্তুষ্টির জান্নাতে প্রবেশ করান। সে ধর্মও পায়, দুনিয়াও পায়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, প্রচেষ্টাকারী কখনো অসফল হয় না, তাঁর সত্য অঙ্গীকার

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(আনকাবুত ঃ ৭০)

অর্থাৎ **"খোদা তাআলার পথের খোজে যে সচেষ্ট হয়, সে শেষ পর্যন্ত উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে।"**

দুনিয়াবী স্কুল-কলেজের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিগ্রহণকারী এবং রাতগুলোকে দিন বানানো শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম ও আবস্থা দেখে যদি, আমাদের হৃদয়ে দয়া হয়, তবে কি সেই আল্লাহ্ তাআলা, যাঁর দয়া এবং কৃপা অসীম ও অফুরন্ত, তাঁর দিকে আগমনকারীদেরকে ব্যর্থ করে দিবেন? কখনো না, কখনো না। আল্লাহ্ তাআলা কারো পরিশ্রমকে বৃথা সাব্যস্ত করেন না। অবমূল্যায়ণ করেন না। (রিপোর্ট জলসা সালানা ১৮৯৭ পৃষ্ঠা ১৬১-১৬২)

কাজেই আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এ মাসে সুযোগ দিয়েছেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে এ মাসে প্রবেশ করিয়েছেন, যাতে রোযাদারদের জন্য অর্থাৎ যারা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য রোযা রাখে সেই রোযাদারদের জন্য এমন প্রতিদান রয়েছে, যে সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং রোযার প্রতিদান দিবেন।

আর এক হাদীসে এসেছে, রোযা ঢাল হয়ে যায়। বান্দা ও আগুনের মাঝে রোযা ঢাল হয়ে যায়। রোযা আল্লাহ্ তাআলার বান্দার ও আগুনের মাঝে মজবুত কিল্লা ও দুর্গ হয়ে যায়, যার দেয়াল পার হয়ে আগুন কখনো আল্লাহ্ তাআলার বান্দাকে জ্বালাতে পারে না। এটা একটা হাদীসে কুদসী, অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.) আল্লাহ্ তাআলার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এ হাদীসের বিস্তারিত বর্ণনা আর এক স্থানে বুখারী শরীফে এভাবে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আদম সন্তান (মানুষ) রোযা ব্যতীত অন্য সকল আমল-ই নিজের জন্য করে। কাজেই, আমার জন্যে-ই রোযা রাখা হয় এবং আমি-ই এর প্রতিদান দেব আর রোযা ঢাল স্বরূপ। যখন তোমাদের মধ্যে কেউ রোযা থাকে, তবে সে যেন কামালাপ ও মুখ খারাপ করা হতে বিরত থাকে আর কেউ যদি তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করে তখন প্রত্যুত্তরে সে যেন বলে, আমি তো রোযাদার। কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্

তাআলার নিকট কস্তুরীর চাইতেও পবিত্র। রোযাদারের জন্য দুটি খুশী, যা তাকে আনন্দিত করে। এক তো যখন সে ইফতার করে তখন আনন্দিত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ যখন সে তার প্রভু-প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করবে তখন সে তার রোযার জন্য আনন্দিত হবে। (বুখারী কিতাবুস সওম)

আর এক বর্ণনায় এসেছে, আঁ হযরত (সা.) বলছেন, রোযা এমন একটি আমল যা মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাআলার জন্য রাখা হয় আর রোযাদারের প্রতিদান সম্পর্কে শুধুমাত্র মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তাআলা-ই জ্ঞাত আছেন। আল্লাহ্ তাআলা নেকী সম্পর্কে বলেন, যারা নেক আমলকারী ও যারা আমলে সালেহ করেন, আমি তাদেরকে সাতশত গুন পর্যন্ত প্রতিদান দিয়ে থাকি বরং এর থেকেও বেশি দিয়ে থাকি কিন্তু রোযার প্রতিদান, বর্ণিত এ সীমার উর্ধ্বে, কতটা উর্ধ্বে সেটা শুধু আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। যেভাবে আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও তাঁর গুণাবলী অসীম, ঠিক সেভাবেই আল্লাহ্ তাআলার প্রতিদানও সীমাহীন। সুতরাং এটা মানবিয় চিন্তার উর্ধ্বে যে, প্রতিদান কতটা হবে। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, এটা শুধু আল্লাহ্ তাআলা জানেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা রোযার সাথে কতগুলো শর্ত আরোপ করে দিয়েছেন যে, এই সীমাহীন প্রতিদান পাওয়ার জন্য তোমাদেরকে তোমাদের সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে, সকল হুকুম-আহকামসমূহ পালন করতে হবে। শুধু ক্ষুধার কষ্ট করো না বরং যেভাবে হাদীসে এসেছে কিছুটা মুজাহেদা (প্রচেষ্টা) করতে হবে এবং মন্দ অভ্যাসগুলো ত্যাগ করতে হবে। সব ধরনের প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও জৈবিক আবেদনকে না বলতে হবে বরং যেভাবে অন্য আর এক স্থানে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, কিছু জায়েয বিষয়ও আল্লাহ্ তাআলার জন্য ছাড়তে হবে। যখন এ অবস্থার সৃষ্টি হবে তখন সে রোযা, খোদা তাআলার জন্য বলে বিবেচিত

**রোযা**
**আল্লাহ্ তাআলার বান্দার ও আগুনের মাঝে মজবুত কিল্লা ও দুর্গ হয়ে যায়, যার দেয়াল পার হয়ে আগুন কখনো আল্লাহ্ তাআলার বান্দাকে জ্বালাতে পারে না।**

হবে। ঐ মন্দ কাজগুলো ছাড়তেই হবে, যা তাকে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য দান করবে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী পরিত্যাগ নয়, এ মন্দ কাজগুলো ক্ষণিকের জন্য ছাড়লে চলবে না বরং স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। যখন এ অবস্থার সৃষ্টি হবে, তখন এরকম রোযা আল্লাহ্ তাআলার জন্য বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ্ তাআলা সেই সত্তা, যিনি মানুষের অভ্যন্তরের খবর রাখেন এবং তিনি হৃদয়ের অবস্থা সম্পর্কেও জ্ঞাত। তিনি জানেন যে, কোন কাজের পিছনে বান্দার কি নিয়্যত রয়েছে। তিনি সেই সত্তা, যিনি প্রকাশ্য ও অদৃশ্য উভয় বিষয়েরই জ্ঞান রাখেন। প্রত্যেক রোযাদার যদি তাঁর গুণাবলীগুলো সম্মুখে রেখে রোযা রাখে এবং প্রচেষ্টা চালু রাখে, তবে সেই রোযা তার জন্য পুরস্কারের কারণ হবে। যে রোযা এ নিয়্যতে রাখা হবে যে, আমি আজ, এসব প্রবৃত্তি ও জৈবিক সম্বোন্ধীয় বিষয়গুলো হতে দূরে সরে যাচ্ছি, এগুলোকে পরিত্যাগ করছি, শুধু রমযান মাসের জন্য নয় বরং সর্বাদার জন্য, তখনই সে রোযা আল্লাহ্ তাআলার জন্য বলে বিবেচিত হবে, খোদার জন্য (রোযা) রেখেছি, এ কথা বলা যাবে। কোন গালির উত্তরে যখন সে বলে আমি রোযাদার, তাই তোমার ফালতু কথার উত্তর দিতে পারছি না, তখন এর অর্থ এটা নয় যে, ইফতার করার পর এর জবাব দিব, তখন তোমাকে দেখিয়ে দিবো যে, আমি কত জলের মাছ, এরপর আমি তোমাকে দেখাবো যে, তুমি বেশি শক্তিশালী না আমি, তাই এ অবস্থায় ঝগড়া করতে পারছি না, কারণ আমি রোযাদার। না বরং রোযা একটি ট্রেনিং ক্যাম্প (Training Camp) স্বরূপ, যেখানে ঐ মন্দ কাজগুলো পরিত্যাগের ট্রেনিং দেয়া হয় আর এটা এক ধরনের প্রচেষ্টা, যা একজন রোযাদারকে করতে হয়। খোদা তাআলার পথে উঠানো সত্যিকার পদক্ষেপ তখনই উঠতে পারে, যখন এক ব্যক্তি নিজ প্রকৃতিতে স্থায়ীভাবে এসব মন্দ কাজ ছাড়ার কাজ চালু রাখবে আর এ অবস্থাতেই তার জন্য সেই শেষ কথা বলা হয়েছে যে, যখন সে তার প্রভু-প্রতিপালক-এর সাথে সাক্ষাত করবে, তখন সে তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে। শুধুমাত্র এ ৩০ (ত্রিশ) দিনের নেকীর কারণে কি

আল্লাহ্ তাআলা তাকে সেই মর্যদাবান স্থান দান করবেন, যা তাঁর সন্তুষ্টির স্থান আর যে স্থানে বান্দা আনন্দিত হবে? না, বরং এজন্য আনন্দিত হবে যে, এক রমযানের রোযা আমার মন্দ অভ্যাসগুলো দূর করে দিয়েছে। আমার প্রবৃত্তি ও জৈবিক অবস্থার পবিবর্তনে চেষ্টা করার জন্য, আমার ইস্তেগফারের জন্য এবং আমি আল্লাহ্ তাআলার খাতিরে মন্দ কাজ পরিত্যাগকারী হব, আমার এ ধরনের প্রচেষ্টার জন্য, আল্লাহ্ তাআলার আমার থেকে আমার মন্দ অভ্যাসগুলো দূর করে দিয়েছেন। যখন কারো জীবনের প্রত্যেক রমযান, যা এমন প্রচেষ্টার নিয়্যতে আসবে এবং বছরের প্রত্যেকটি মাস, যা এই রমযানে অর্জিত নেকীগুলোকে বহন করে অতিবাহিত হবে, বছরের প্রতিটি দিন, যা এই ত্রিশ দিনের ট্রেনিং-এর প্রেক্ষিতে মন্দ কাজ হতে দূরত্ব সৃষ্টি করতে থেকে অতিবাহিত হবে, তবে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিভাজন বলে বিবেচিত হবে এবং তার জন্য সেই (মাকাম) স্থান হবে, যেখানে বান্দা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, এই রমযানের কল্যাণে, আল্লাহ্ তাআলা আমার থেকে আমার মন্দ অভ্যাসগুলো দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে আমার নেকী ও তাক্ওয়ায় উন্নতি করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি তাঁর জন্য নিষ্ঠার সাথে রোযা রেখেছি এবং এ রোযাগুলোর মুজাহেদার মাধ্যমে নিজের আমলসমূহের সংশোধনের চেষ্টা করেছি, নিজের ইবাদতের অবস্থার উন্নতি করেছি আর তাই আজ আমি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিভাজন বলে বিবেচিত হচ্ছি।

সুতরাং যেহেতু রমযান মাস এসেছে, সেহেতু নিজেদের ইবাদতের মান উন্নয়নও জরুরী এবং নিজেদের আমলসমূহের দিকে দৃষ্টি রেখে, সেগুলোকে আল্লাহ্ তাআলার হুকুম-আহকামের ছাঁচে ঢালাও জরুরী। একজন ছাত্র পরীক্ষার সময় এমনভাবে পরিশ্রম করে যে, রাতগুলোকে যেন দিন বানিয়ে ফেলে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, এ দিনগুলোতে আমরাও যখন আমাদের রাতগুলোকে আল্লাহ্ তাআলার খাতিরে অতিবাহিত করব তখনই, সেই রহীম (বার বার কৃপাকারী) ও করীম (দাতা) খোদা, সেই আহ্বানে সাড়াদাতা খোদা তাঁর অঙ্গীকার অনুযায়ী আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে নিয়ে দাঁড় করবেন। আমাদেরকে সেই পথের দিকে নিয়ে আসবেন, যেটি তাঁর সন্তুষ্টির পথ। আমাদেরকে তিনি ঐ সকল পুরস্কারে ভূষিত করবেন, যে পুরস্কারে তিনি তাঁর বিশেষ বান্দাদের ভূষিত করেছেন। তিনি আমাদের তাক্ওয়ার মানকে সেখান পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন যেখানে তাঁর নৈকট্য লাভ হয়।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা যদি রোযাকে ঢাল বানিয়ে থাকেন তবে সে ঢালের ব্যবহারও হতে হবে। ঢাল যদি নিজের সামনে সঠিকভাবে রাখা না হয়, একে যদি শক্ত করে না ধরা হয়, তবে আক্রমণকারীর এক আঘাতেই সেটি পড়ে যাবে, তখন সেই ঢাল আর ঢালের কাজ করতে পারবে না। কাজেই, শয়তান যেহেতু সকল আক্রমণকারীর চাইতে ভয়ঙ্কর আক্রমণকারী, সেহেতু তার আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতের মান উন্নয়ন করে, নিজেদের রাতগুলোকে জীবিত করে এবং আল্লাহ্ তাআলার হুকম-আহকামকে মজবুতভাবে ধরার মাধ্যমেই একজন মু'মিন, রোযার ঐ ঢাল হতে সঠিকভাবে লাভবান হতে পারে। এ ট্রেনিং-এর দিনগুলো আল্লাহ্ আমাদের জন্য সহজলভ্য করে দিয়েছেন। রোযা তখনই জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচানোর জন্য কিল্লার কাজ করবে, যখন কিল্লার প্রত্যেক দরজায় নিজের ইবাদত ও আমল সমূহের পাহাড়া বসানো হবে, অতঃপর এই পাহাড়া ও মজবুত কিল্লার দেয়াল, যা আল্লাহ্ তাআলা নিজ ফযলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, তা প্রত্যেক মু'মিন বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে এ দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও বাঁচাবে। আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ ও তাক্ওয়ার পথে চলা-ই এক মু'মিন বান্দার জীবনে বিপ্লব ঘটিয়ে পার্থিব নেয়ামতের দ্বারাও তাকে সৌভাগ্যশালী করবে এবং আখেরাতেও। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার দান করা ব্যবস্থা হতে আমাদের লাভবান হওয়া উচিত। তাঁর আদেশ মোতাবেক এ দিনগুলো অতিবাহিত করে আপনারা তাক্ওয়ার অবস্থার উন্নতি করুন।

আঁ হযরত (সা.)-এর পূর্বে যে সকল নবীগণ এসেছেন, তাঁরা তো ক্ষণস্থায়ী শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, যা পরে হারিয়ে গেছে। সে শিক্ষাতো সাময়িক তাকওয়া দান করত, এ শিক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই এর সজিবতা ও তাক্ওয়া আর অবশিষ্ট থাকেনি। কিন্তু

আমি যেভাবে বলেছি যে, ইসলামের শিক্ষা তো সর্বদাই সজিব ও প্রাঞ্জল, কুরআন করীমের হুকুম-আহকাম তো সর্বদা প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য ধর্মের রোযায় তো প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আমাদের তো শিক্ষাও জীবন্ত এবং হুকুম-আহকামও প্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আমাদেরকে আমাদের তাক্ওয়ার মানকে অক্ষুন্ন রাখতে সর্বদা চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে থাকা জরুরী। আমাদেরকে তাক্ওয়ার সিঁড়িতে পা রেখে, আল্লাহ্ তাআরার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য পাওয়ার জন্য এবং আল্লাহ্ তাআলার উচ্চ থেকে উচ্চতর স্থান অর্জনের জন্য, তিনি যে পথ দেখিয়েছেন, সেগুলাকে অর্জন করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সেই সিঁড়িও দান করেছেন, যাতে আমাদের চড়তে হবে আর যার উচ্চতার কোন সীমা নেই। কাজেই, আমাদের প্রত্যেককে আমাদের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী সেই উচ্চতাকে অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। একের পর এক ধাপ ফেলে উপরের দিকে যাওয়া উচিত এবং এর জন্য চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সর্বোত্তম উম্মত বানিয়ে ইবাদতের সু-উচ্চ পথও দেখিয়েছেন এবং আমলে সালেহ-এর সু-উচ্চ পথও দেখিয়েছেন। কাজেই, আমরা তখনই নিজেদের সর্বোত্তম উম্মত বলতে পারব, যখন এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে, একের পর এক মানদন্ডের বিচারে উতরে যাওয়ার চেষ্টা-প্রচেষ্ট করতে থাকব। অতএব, আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করা আমলকেই তাক্ওয়া বলে, যা লাভের জন্য রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এই রমযানে তাক্ওয়া লাভের জন্য মুজাহেদা (সাধ্য মত চেষ্টা} করার তৌফিক দান করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, লোকের রোযার বাস্তবতা সম্পর্কেও অজ্ঞ। ... মানুষ ক্ষুধার্ত থাকবে এটার নামই রোযা নয় বরং এর তাৎপর্য ও প্রভাব রয়েছে, যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে হয়। মানব প্রকৃতিতে রয়েছে, যত কম খায় ততবেশী আত্মশুদ্ধি লাভ হয় এবং কাশফি (দিব্য-দর্শনের) শক্তি বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে খোদা তাআলার চাওয়া হচ্ছে, এক ধরনের আহার ত্যাগ কর এবং অন্য ধরনের আহার বাড়াও। সর্বদা রোযাদারকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত যে, এতে ক্ষুধার্ত থাকাই উদ্দেশ্য নয় বরং তার উচিত সে যেন আল্লাহ্ তাআলার যিকরে ব্যস্ত থাকে, যার মাধ্যমে (আল্লাহ্ তাআলার জন্য) নির্জনতা ও ছিন্নতা অর্জিত হয়। সুতরাং রোযার এটাই উদ্দেশ্য যে, মানুষ যেন দেহের প্রতিপালনকারী এক রুটি ত্যাগ করে আর রূহ (আত্মার) জন্য প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি দানকারী আরেক রুটি অর্জন করে। যে সব লোক শুধু খোদার জন্য রোযা রাখে ও শুধু প্রাণহীন প্রথার বশবর্তী হয়ে রাখে না, তাদের উচিত, তারা যেন আল্লাহ্ তাআলার হামদ (প্রশংসা), তাসবীহ (পবিত্রতা) ও তাহলীল (একত্ব ঘোষণা) করায় লেগে থাকে, যার মাধ্যমে তারা অন্য আহার প্রাপ্ত হয়। ( আল হাকাম, ১১তম খন্ড, নম্বর-২ তারিখ ১৭ জানুয়ারী ১৯০৭ ইং ৯ পৃষ্ঠা)

সুতরাং এটা হচ্ছে রোযাদারের উদ্দেশ্য, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য ও তাক্ওয়া লাভ হয়। এমন বান্দাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা আগবেড়ে নিজ কোলে তুলে নেন, তাকে তাঁর মারেফত (তত্ত্বজ্ঞান) দান করেন এবং নিজ পুরস্কারে ভূষিত করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এটা খোদা তাআলার সত্য ওয়াদা যে, যারা সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ে নেক নিয়্যত নিয়ে তাঁর পথ অন্বেষণ করে, তিনি তাদের নিকট হেদায়াত ও মারেফত (তত্ত্বজ্ঞান)-এর পথসমূহ খুলে দেন, যেভাবে তিনি স্বয়ং বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(আনকাবুত ঃ ৭০)

অর্থাৎ **“যেসব লোক একমাত্র আমাদের হয়ে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে, আমরা তাদের জন্য আমাদের রাস্তা খুলে দেই।”** বলেন, আমাদের হওয়ার অর্থ, তারা শুধু মাত্র একনিষ্ঠ ও নেক নিয়্যতের ভিত্তিতে খোদাপ্রাপ্তিকে-ই নিজের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়।” (আল হাকাম, ৮ম খন্ড, ১৮ নম্বর, ৩১ মে ১৯০৪ইং পৃষ্ঠা-২) অর্থাৎ খোদাকে অন্বেষণ করাই তাদের উদ্দেশ্য, তারাই ঐ সকল লোক যারা সত্যিকার অর্থে চেষ্টা করে।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন, আমরা যাতে খোদা তাআলার সন্তুষ্টিকে নিজেদের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে এ রমযান অতিবাহিত করি এবং আমাদের রোযাগুলো যেন

শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্য হয় আর আমরা যেন তাক্ওয়ায় অগ্রগামী হই। আমরা যেন খোদার তত্ত্বজ্ঞানও লাভ করি, যা আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশ হয় এবং সর্বদা আমাদেরকে তাক্ওয়ায় অগ্রগামী বানায়।

হুযূর আনোয়ার খুৎবা-এ সানিয়ার মাঝে বলেন,

এখন আমি গত কয়েকদিনে মৃত্যুবরণকারীগণের উল্লেখ করব, যদিও তাদের জানাযা হয়ে গেছে কিন্তু তাঁদের জন্য ও তাঁদের সন্তানদের জন্যেও তাঁদের উল্লেখ করতে চাচ্ছি, বুযুর্গদের সাথে এঁদের সম্পর্ক রয়েছে। একজন মোহতরমা সাঈদা বেগম সাহেবা। ইনি মরহুম মাওলানা জালাল উদ্দিন শাম্স সাহেবের গৃহিনী। ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭ইং তারিখে আমেরিকায় তাঁর মৃত্যু হয়। ইনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী খাজা উবাইদিল্লাহ্ সাহেবের মেয়ে ছিলেন এবং খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-ই হযরত শাম্স সাহেবের সাথে তাঁর বিয়ে দেন। ১৯৩২ইং সালে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর কুরবানীর উদাহরণ দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৯৫৬ইং সালের লাজনার ইজতেমায় বলেছিলেন, আমাদের একজন মুবাল্লেগ মৌলভী জালাল উদ্দীন শাম্স সাহেব। তিনি বিয়ের কিছু দিন পর ইউরোপ যান, ইউরোপে তবলীগের জন্য চলে গিয়েছিলেন। তাঁর ঘটনা শুনলেও কান্না পায়। একদিন তাঁর ছেলে বাড়ি এসে তার মাকে বলছিল, আম্মা! আব্বা কাকে বলে? স্কুলে সব ছেলেরা আব্বা আব্বা বলে, আমি জানি-ই না আমার আব্বা কোথায় গেছেন। কেননা এ বাচ্চার তিন চার বছর বয়সে শাম্স সাহেব তবলীগের জন্য লন্ডন চলে যান। এখানে, লন্ডনে তবলীগের জন্য থেকে যান আর যখন ফিরে আসেন, তখন ছেলের বয়স ১৭-১৮ বছর। ঐ সময় তিনি খুব বড় ধরনের ত্যাগ স্বীকার করে ছেলেকে প্রতিপালন করেন এবং কোন প্রকার অভিযোগ না করে একা একা বাস করেন। ঐ সময় এমন অবস্থা ছিল যে, মুবাল্লেগদের সাথে পরিবার থাকত না। সে যুগের মুবাল্লেগগণ ও তাঁদের স্ত্রীগণ অনেক কুরবানী করতেন। মরহুমা মুসী ছিলেন। খুব নেক মহিলা ছিলেন। মুনীর উদ্দিন সাহেব শামসের মা ছিলেন, যিনি আমাদের উকিলুত তাসনীফ এবং তিনি ছাড়া আরো চার ছেলে রয়েছে।

দ্বিতীয় জন হচ্ছেন, মোহতরমা মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবের স্ত্রী সাঈদা বেগম সাহেবা। তিনিও প্রায় ৯৫ বছর বয়সের ছিলেন। তিনি ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৭ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর জানাযা হয়ে গেছে। ইনিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মৌলভী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব বাটালবী (রা.)-এর মেয়ে। হযরত আম্মাজান (রা.)-এর কথার মত হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ইনার বিয়েও মাওলানা আবুল আতা সাহেবের সাথে দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজে এ বিয়ের এলান করেন। ইনিও অনেক নেক ও ইবাদতগুজার মহিলা ছিলেন। তিনি আমাদের মসজিদের ইমাম মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেবের মা। খিলাফতের সাথে এ দুই বুজুর্গের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইনি এখানে লন্ডন থাকতেন এবং আমার সাথে সাক্ষাতও করতেন। তাঁর চোখে এক আশ্চর্য ভালবাসা, বিশ্বস্ততা ও একনিষ্ঠতার ঝলক ছিল। তিনি আটের এক অংশ ওসীয়্যত করেছিলেন।

তৃতীয় জন হচ্ছেন সৈয়্যদ মোহাম্মদ সাহেবের স্ত্রী নাসেরা বেগম সাহেবা। তিনি ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ইনিও এক সাহাবীর মেয়ে ছিলেন, যিনি গুরুদাসপুর জেলার একটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল চৌধুরী ফকীর মুহাম্মদ সাহেব। তাঁর পিতা ১৯৪৭-এর দেশ বিভক্তির সময় শহীদ হয়েছিলেন। যখন লাওয়ায়ে আহমদীয়াতের জন্য কাপড় বানানো হচ্ছিল তখন তাঁর পিতা নিজ হাতে কাপড় বানিয়ে ছিলেন আর তিনি বড় নির্ভীক দা-ইলাল্লাহ্ ছিলেন। ইনি নিজেও বড় নির্ভীক দা-ইলাল্লাহ্ ছিলেন এবং নিজে মহিলাদেরকে সাথে নিয়ে তবলীগ করতেন। ইনার চার ছেলে, এদের মধ্যে একজন তো আমাদের আমেরিকার মুবাল্লেগ দাউদ হানিফ সাহেব। তাঁর আরেক ছেলে এখানকার জামাআতের সেক্রেটারী উমরে আমাহ্ মনোয়ার সাহেব।

এ মহিলাগণ বড় নেক, খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষাকারী ও দোয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা এঁদের সকলের মর্যাদা উচ্চ করুন এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিদেরকে তাঁদের নেকী বহমান ও প্রতিষ্ঠিত রাখার তৌফিক দান করুন।

অনুবাদ ঃ **মুহাম্মদ আক্রামুল ইসলাম**

মুরব্বী সিলসিলাহ্

# কুরআন আমার প্রিয় কুরআন

আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(৪র্থ কিস্তি)

আও ঈসাইও! ইধার আও নূরে হাক্ক পাও!

জিস কাদার খুবিয়াঁ হ্যাঁ কুরআঁ মেঁ

কাহিঁ ইনজীল মেঁ তো দিখলাও!!

(এস খৃষ্টানগণ, এদিকে এস, সত্যের জ্যোতি লাভ কর,

যতটা সৌন্দর্য আছে কুরআনে ইন্জিলে তা কোথায় দেখাও)

–দুর্‌রে সামীন।

## বাইবেল ও কুরআনের শিক্ষা ও তথ্যাদির তুলনামূলক আলোচনা

প্রথমে এটা আলোচনা করা আবশ্যক, কেন এ বিষয়টির অবতরণা করা হচ্ছে? হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উপাধি হলো 'কাসিরুস্ সালীব' বা ক্রুশ ধ্বংসকারী। ক্রুশ ধ্বংস করার এ অর্থ নয় যে তিনি (আ.) কাঠ লোহা বা পিতলের ক্রুশগুলো ধ্বংস করবেন বরং তিনি (আ.) ক্রুশীয় মতবাদকে ভুল প্রমাণিত করে ইহুদী খৃষ্টান ও মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাসকে সঠিক করে দেবেন। কেননা, এ ক্রুশীয় বিষয়টি নিয়ে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ ভুলের মাঝে পড়ে রয়েছে। তাছাড়া বাইবেল ঐশী গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও এর মাঝে কতগুলো বিবেক ও সত্যবিরুদ্ধ ধ্যানধারণা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে যুগযুগান্তর ধরে। সেগুলো কুরআনের সমুজ্জ্বল আলোকে দেখিয়ে দেয়া যাতে বিশ্বের মানবগোষ্ঠির আকিদা বিশ্বাস সঠিক ও দুরস্ত হয়ে যায়। তারা ইসলাম ও কুরআনের সঠিক পথনির্দেশনা লাভ করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষার আলোকে কয়েকটি তথ্য তুলে ধরা হলো ঃ

### বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি

বাইবেল বলে ঃ

"এইরূপে আকাশমন্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তু ব্যূহ সমাপ্ত হইল। পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন (আদি পুস্তক–২ ঃ ২-৩)

এ প্রসঙ্গে কুরআন করীম বলে ঃ

"নিশ্চয় তোমাদের প্রভু প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশমালা ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আরশে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন........." (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৫)।

*কুরাআন এমন এক আল্লাহ্‌র পরিচয় দেয় যিনি হাইয়্যুল (চিরঞ্জীব-জীবনদাতা) এবং কাইয়্যুম (চিরস্থায়ী স্থায়ীত্বদাতা)।*

কুরাআন এমন এক আল্লাহ্‌র পরিচয় দেয় যিনি হাইয়্যুন (চিরঞ্জীব-জীবনদাতা) এবং কাইয়্যুম (চিরস্থায়ী স্থায়ীত্বদাতা)। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার বিশ্রাম নেয়া তাঁর মহা সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী। তাঁর বিশ্রাম নেয়া শোভা পায় না। কুরআন করীমে সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।' তিনি ক্লান্তি নিদ্রা ও তন্দ্রার অতীত। তাই তাঁর বিশ্রামেরও প্রয়োজন হয় না। তিনি যদি ক্লান্ত হতেন এবং বিশ্রাম নিতেন তাহলে কবে তাঁর সৃষ্টি লন্ড ভন্ড হয়ে যেতো। আর এতদিনে তিনি হয়ত বৃদ্ধ হয়ে যেতেন বা নাউযুবিল্লাহ্ মারাই যেতেন। কিন্তু কুরআনের আল্লাহ্ এসব কিছুর ঊর্ধ্বে। তিনি সদা প্রহরীর ন্যায় তাঁর সৃষ্টিকে প্রতিপালন করে আসছেন। তাইতো বলা হয়েছে, সব কিছু সৃষ্টির পর এ সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তিনি তাঁর সব গুণকে সুসমন্বিত করলেন অর্থাৎ আরশে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। বিশ্রাম নেয়ার অবকাশই কোথায় তাঁর?

### ত্রিত্ববাদ

ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে খৃষ্টানদের প্রচলিত বিশ্বাস এই, পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। এ প্রসঙ্গে Jhon 5.7 বলা হয়েছে "For there are three that bear witness in the heaven, the Father, the word and the Holy Ghost, These three are one (A pocket book of Biblical References by Naeem Osman memon and published by Islam International Publications Ltd.)

"এতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর...., পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তস্তাইজ কর" (মথি - ২৮ ঃ ১৯)।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের ভাষ্য হলো ঃ

"নিশ্চয় তারা অস্বীকার করেছে যারা বলে, 'আল্লাহ্ তিনের মধ্যে তৃতীয়'। অথচ একজন উপাস্য ছাড়া আর কোন উপস্য নেই" (সূরা আনআম ঃ ৭৪)।

আর কুরআন কেন স্বয়ং বাইবেলও এ মিথ্যা অবাস্তব অযৌক্তিক বিশ্বাসকে প্রত্যাখান করছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে ঃ

"হে ইস্রায়েল শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদা প্রভু। আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদা প্রভুকে প্রেম করিবে" (দ্বিতীয় বিবরণ- ৬ ঃ ৪-৫)।

"সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের রাজা, তাহার মুক্তিদাতা, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমিই আদি, আমিই অন্ত, আমি ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই" (যিশাইয়- ৪৪ঃ ৬)। আবার বলা হয়েছে ঃ "আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই; আমি ধর্মশীল ও ত্রাণকারী ঈশ্বর; আমি ব্যতীত অন্য নাই" (প্রাগুক্ত, ৪৫ঃ২১-২২)।

"কেননা লেখা আছে, 'তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে" (মথি ঃ ৪ ঃ ১০)

"অধ্যাপক তাহাকে কহিল, বেশ গুরু, আপনি সত্য বলিয়াছেন যে, তিনি এক এবং তিনি ব্যতীত অন্য নাই" (মার্ক ঃ ১২ ঃ ৩২-৩৩)।

"যিশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে কেন সত্য বলিতেছ? একজন ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর" (লুক - ১৮ ঃ ১৯)।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হবার আশঙ্কায় আরও উদ্ধৃতি প্রদানে বিরত থাকলাম। খ্রিষ্টান ভাইদের এ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, সদাপ্রভু একজনই। যিশু কোন খোদা নন। তিনি মনুষ্য পুত্র। তিনি খোদা হতে পারেন না।

**প্রায়শ্চিত্তবাদ**

আর যে বিষয়টি খ্রিষ্টবাদের মৌলিক ভিত্তি তা হলো প্রায়শ্চিত্তবাদ। এ প্রসঙ্গে খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস এই, আদি পিতা আদম থেকে মানুষ যে পাপ করে এসেছে খোদার পুত্র ঈসা ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ২টি উদ্ধৃতি মাত্র উপস্থাপন করা হলো ঃ

"তাঁহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে" (যোহনের প্রথম পত্র ১:৭)

"কিন্তু তিনিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন, এবং আপন পুত্রকে আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত হইবার জন্য প্রেরণ করিলেন" (যোহনের প্রথম পত্র ৪ ঃ ১০)।

এ প্রসঙ্গে কুরআন করীমের শিক্ষা হলো ঃ

(১) "তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি" (সূরা ইখলাস)।

(২) "সেই দিনকে ভয় কর যখন কোন আত্মার বিনিময়ে অন্য কোন আত্মা কাজে আসবে না এবং তার কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং কোন সুপারিশ তার কোন উপকার সাধন করবে না আর তাদের কোন সাহায্যও করা হবে না" (সূরা বাকারা ঃ ১২৪)।

খৃষ্টানদের এ বিশ্বাসকে স্বয়ং বাইবেলও খন্ডন করে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

(১) "সন্তানের জন্য পিতার, কিম্বা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণ দন্ড করা যাইবে না; প্রতিজন আপন আপন পাপ প্রযুক্তই প্রাণদন্ড ভোগ করিবে" (দ্বিতীয় বিবরণ-২৪ঃ১৬)।

(২) "প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল দিবেন" (যোহন ১৬ঃ২৭)

(৩) "কিন্তু প্রত্যেক জন নিজ নিজ কর্মের পরীক্ষা করুক, তাহ হইলে সে কেবল আপনার কাছে শ্লাঘা করিবার হেতু পাইবে অপরের কাছে নয়; কারণ প্রত্যেক জন নিজ নিজ ভার বহন করিবে" (গালাতীয় ৬ঃ৪-৫)।

প্রায়শ্চিত্তবাদই খ্রিষ্টবাদের মূল ভিত্তি। আর এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলেই নাজাত বা মুক্তি। এ অযৌক্তিক অবাস্তব ও নোংরা বিশ্বাসই আজ খ্রিষ্টানদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পতনের মূল কারণ। এ বিষয়ে বিস্তারিত বলার অবকাশ এখানে নেই। এ বিশ্বাসকে খন্ডন করে কাসিরুস সলীব হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর বিভিন্ন পুস্তকে বহু যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এখানে তাঁর পুস্তক 'খৃষ্টান সিরাজ

*মনে হচ্ছে খ্রিষ্টানদের মতে যীশু খ্রিষ্ট পৃথিবীতে এসেছিলেন পাপীদের সাথে প্রেম করে তাদের পাপের অভিশাপ নিজ মাথায় বহন করে সেসব পাপীর পরিত্রাণের জন্যে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করে ক্রুশে প্রাণ দিতে। কুরআন পাপীদের মুক্তির জন্যে এ ধরনের অভিশপ্ত কুরবানী উপস্থাপন করে না। কোটি কোটি মানুষের পাপের অভিশাপ একত্র করে একজনের স্কন্ধে চাপানো দূরে থাকুক এক ব্যক্তির পাপ অন্য ব্যক্তির স্কন্ধে চাপানোও কুরআন সঙ্গত ও বৈধ মনে করে না।*

উদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর' থেকে অংশবিশেষ নিজ ভাষায় উপস্থাপন করছি ঃ

তিনি (আ.) বলেছেন, মনে হচ্ছে খ্রিষ্টানদের মতে যীশু খ্রিষ্ট পৃথিবীতে এসেছিলেন পাপীদের সাথে প্রেম করে তাদের পাপের অভিশাপ নিজ মাথায় বহন করে সেসব পাপীর পরিত্রাণের জন্যে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করে ক্রুশে প্রাণ দিতে। কুরআন পাপীদের মুক্তির জন্যে এ ধরনের অভিশপ্ত কুরবানী উপস্থাপন করে না। কোটি কোটি মানুষের পাপের অভিশাপ একত্র করে একজনের স্কন্ধে চাপানো দূরে থাকুক এক ব্যক্তির পাপ অন্য ব্যক্তির স্কন্ধে চাপানোও কুরআন সঙ্গত ও বৈধ মনে করে না। কুরআনের স্পষ্ট উক্তি হলো ঃ 'একের পাপ অন্যে বইবে না' (সূরা আনআম ঃ ১৬৫)

আসলে পাপ এমন এক বিষ যা তখনই সৃষ্টি হয় যখন মানুষ খোদা তাআলার প্রতি আনুগত্য, প্রেম এবং তাঁর স্মরণ থেকে স্খলিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে খোদাকে ভুলে গিয়ে পার্থিবতায় নিমজ্জিত হয়। মাটি থেকে কোন গাছ উপড়ে ফেললে তা যেমন রস শোষণ করার ক্ষমতা হারিয়ে দিন দিন শুকোতে থাকে আর পরিশেষে এর সরস ও সজীবতা বিনাশপ্রাপ্ত হয় তেমনি যার মন খোদাপ্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার অবস্থাও অনুরূপ। এ পাপরূপী শুষ্কতার প্রতিকার হিসেবে খোদা তাআলার বিধানে ৩টি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে ঃ (ক) খোদাপ্রেম, (২) ইস্তিগফার (এর অর্থ চেপে বা ঢেকে দেয়ার আকাঙ্ক্ষা) এবং (৩) তওবা বা অনুশোচনা। অর্থাৎ জীবন বারী আকর্ষণ করার জন্যে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর কাছে প্রেমের দাবী নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা। গাছ যেমন মাটির রস গ্রহণ করে তা নিজের মাঝে টেনে নেয় আর এর সাহায্যে নিজের মাঝে বিষাক্ত বায়ু বের করে ফেলে মানুষের অবস্থাও এ রকম। সে খোদা তাআলার প্রেমবারি গ্রহণ করত: ইস্তিগফার ও অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে নিজের মাঝ থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে ফেলতে সক্ষম হয়। অতএব পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রতিকার হলো খোদা তাআলার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা। প্রাকৃতিক বিধান এ সাক্ষ্যই দিচ্ছে। এর প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআন করীমে বলা হয়েছেঃ 'হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তোমার প্রভু প্রতিপালকের দিকে ফিরে এস। এমতাবস্থায় যে তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতএব তুমি আমার দাসদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর" (সূরা ফজর ঃ ২৮-৩১)। সুতরাং পাপ থেকে মুক্তির জন্যে কোন প্রায়শ্চিত মৃত্যুর প্রয়োজন হয় না।

## বাইবেল বিভিন্ন নবীর চরিত্রে কালিমা লেপন করেছে ঃ কুরআনের খন্ডন

নীতিগতভাবে কুরআন করীম প্রত্যেক নবীকেই সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান বলে আখ্যায়িত করেছে। যেমন কুরআন করীম বলেছে ঃ **ওয়ামা কানা লিনাবীয়্যিন আঁই ইয়াগুল্লা** অর্থাৎ কোন নবীর পক্ষে এটা সম্ভবই নয় যে সে অবিশ্বস্ততা করবে-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬২ আয়াতাংশ) আবার বলা হয়েছে **ইন্নাহুম মিনাস সালেহীন** অর্থাৎ তারা সবাই ছিল সৎকর্মশীল (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৭ আয়াতাংশ)। এরপরও বাইবেল বিভিন্ন নবী সম্বন্ধে এমন সব মিথ্যা কদর্য ও অসম্মানজনক উক্তি করেছে যা একজন নবী কেন সাধারণ মানুষের পক্ষেও শোভা পায় না। আমরা উদাহরণস্বরূপ এর কয়েকটি প্রথমে বাইবেলের ভাষ্য থেকে এবং পরে কুরআন করীমের ভাষ্য উল্লেখ করে দেখাবার চেষ্টা করবো, এ প্রসঙ্গে কুরআনে করীম কত স্বচ্ছতার সাথে সঠিক বিষয়টি উপস্থাপন করেছে।

প্রথমেই হযরত লূত (আ.)-এর কথা নেয়া যাক। তাঁর (আ.) সম্পর্কে বাইবেল বলে ঃ

"পরে লোট ও তাহার দুইটি কন্যা সোয়র হইতে পর্বতে উঠিয়া গিয়া তথায় থাকিলেন; কেননা তিনি সোয়রে বাস করিতে ভয় করিলেন আর তিনিও তাহার দুই কন্যা গুহার মধ্যে বসতি করিলেন। পরে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে কহিল, আমাদের পিতা বৃদ্ধ, এবং জগৎসংসারের ব্যবহার অনুসারে আমাদিগেতে উপগত হইতে এদেশে কোন পুরুষ নাই, আইস আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া তাঁহার সহিত শয়ন করি, এইরূপে পিতার বংশ রক্ষা করিব। তাতে তাহারা সেই রাত্রিতে আপনাদের পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল, পরে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সহিত শয়ন করিতে গেল, কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওয়া লোট টের পাইলেন না। আর পর দিন জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কহিল, দেখ, গত রাত্রিতে আমি পিতার সহিত শয়ন করিয়াছিলাম, আইস আমরা অদ্য রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাই, পরে তুমি যাইয়া তাহার সহিত শয়ন কর, এইরূপে পিতার বংশ রক্ষা করিব। এইরূপে তাহারা সেই রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল; পরে কনিষ্ঠা উঠিয়া তাহার সহিত শয়ন করিল; কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওয়া লোট টের পাইলেন না। এইরূপে লোটের দুই কন্যাই আপনাদের পিতা হইতে গর্ভবতী হইল। পরে জ্যেষ্ঠা কন্যা পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম

মোয়াব রাখিল; সে এখনকার মোয়াবীয়দের আদি পিতা। আর কনিষ্ঠা কন্যা পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম বিন-অম্মি রাখিল, সে এখানকার অম্মোন সন্তানদের আদিপিতা" (আদি পুস্তক ১৯ ঃ ৩০-৩৮) এ উপখ্যান যে হিন্দু উপখ্যানকেও হার মানিয়েছ এতে কোন সেন্দেহ নেই। অথচ কুরআন করীম কত সুন্দরভাবে হযরত লূত (আ.)-এর চরিত্রকে বর্ণনা করে তাঁর সম্বন্ধে অপবাদ খন্ডন করেছে ঃ

"আর লূতকে আমার হিকমত ও জ্ঞান দান করেছিলাম। আর তাকে সেই জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম যারা জঘন্য কাজ করতো। নিশ্চয় তারা ছিল অতি মন্দ ও দুষ্কৃতকারী।

আর আমরা তাকে আমাদের কৃপার মাঝে প্রবিষ্ট কলাম। নিশ্চয় সে ছিল সৎকর্মশীলদের একজন" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৫-৭৬)।

এরপর হযরত দাউদ আলায়হেস সালামের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর (আ.) সম্পর্কে বাইবেল বলে ঃ

"একদা বৈকালে দায়ুদ শয্যা হইতে উঠিয়া রাজবাটীর ছাদে বেড়াইতেছিলেন, আর ছাদ হইতে দেখিতে পাইলেন যে, একটি স্ত্রীলোক স্নান করিতেছে, স্ত্রী লোকটি দেখিতে খুবই সুন্দর ছিল। দায়ুদ তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন। একজন কহিল, এ কি ইলিয়ামের কন্যা, হিত্তীয় ঊরিয়ের স্ত্রী বৎশেবা নয়? তখন দায়ুদ দুত পাঠাইয়া তাহাকে আনাইলেন এবং সে তাহার নিকট আসিলে দায়ুদ তাহার সহিত শয়ন করিলেন; সে স্ত্রী ঋতুস্নান করিয়া শুচি হইয়াছিল। পরে সে আপন ঘরে ফিরিয়া গেল। পরে সে স্ত্রী গর্ভবতী হইল; আর সেই লোক পাঠাইয়া দায়ুদকে সমাচার দিল, আমার গর্ভ হইয়াছে (২ শমূয়েল ১১ ঃ ২-৫)। পরবর্তীতে দেখা যায় দায়ুদ হিত্তয়ি উরিয়াকে মেরে ফেলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইঞ্জিল অনুযায়ী দাউদ (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-এর দাদা। অর্থাৎ তাঁকে যারা খোদা মনে করে তার দাদাকে তারা ব্যভিচারী বলে থাকে। ধিক্ শত ধিক!!

অথচ কুরআন করীম হযরত দাউদ (আ.) সম্পর্কে বলে ঃ

"আমাদের বান্দা দাউদকে স্মরণ কর যে বড় শক্তির অধিকারী ছিল, নিশ্চয় সে আল্লাহ্‌র দিকে বার বার ঝুঁকতো" (সূরা সাদ ঃ ১৮)।

হযরত সুলায়মান সম্বন্ধে বাইবেলে লেখা আছে ঃ "ফলে এইরূপ ঘটিল, শলোমনের বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার স্ত্রীরা তাহার হৃদয়কে অন্য দেবগণের অনুগমনে বিপথগামী করিল; তাঁহার পিতা দায়ুদের অন্তঃকরণ যেমন ছিল, তাঁহার অন্তঃকরণ তেমনি আপন ঈশ্বর সদা প্রভুর ভক্তিতে একাগ্র ছিল না" (১ রাজাবলী-১১ ঃ ৪)। আবার বলা হয়েছে ঃ

"অতএব সদা প্রভু শলোমনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন, কেননা তাহার অন্তঃকরণ ইস্রায়েলের সদাপ্রভু হইতে বিপথগামী হইয়াছিল, যিনি তাহাকে দুইবার দর্শন দিয়াছিলেন, এবং এই বিষয়ে তাঁহাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, যেন তিনি অন্য দেবগণের অনুগামী না হন; কিন্তু সদা প্রভু যাহা আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহা তিনি পালন করিলেন না" (১ রাজবলী ১১ ঃ ৯)

কিন্তু কুরআন করীম হযরত সুলায়মানের প্রতি আরোপিত এ অভিযোগ খন্ডন করে বলেছে ঃ

**ওয়ামা কাফারা সুলায়মানু ওয়া লাকিন্নাশ্ শায়াত্বিনা কাফারূ ইউ'আল্লিমুনান্নাসাস্ সিহ্‌রা** অর্থাৎ আর সুলায়মান কুফরী করেনি বরং বিদ্রোহীরা কুফরী করেছিল তারা লোকদের প্রতারণামূলক যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতো (সূরা বাকারা ঃ ১০৩ আয়াতাংশ)। হযরত সুলায়মান কখনও কুফরী করেন নি বরং তিনি (আ.) প্রজ্ঞার সাথে সাবার সূর্যপূজারী রাণী বিলকিসকে তৌহীদের বাণী শুনিয়েছিলেন যেভাবে কুরআনে এসেছে ঃ

"আর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যার ইবাদত করতো সে (অর্থাৎ সুলায়মান) তাকে বিরত রাখল। নিশ্চয় সে (অর্থাৎ সাবার্ রাণী) কাফির জাতির মাঝে গণ্য ছিল।................

তখন সে (অর্থাৎ সাবার রাণী) বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার প্রাণের ওপর যুলম করেছি; আমি সুলায়মানের সাথে সারা বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করলাম" (সূরা নামল ঃ৪৪-৪৫)।

## হযরত হারূন (আ.)-এর ঘটনা

হযরত হারূন আলায়হেস সালামের ব্যাপারেও বাইবেল মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেছে (যাত্রা পুস্তক ৩২ ঃ ১-৪) যে তিনি হযরত মূসার অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈলের জন্যে একটি গোবৎস তৈরী করে দিয়েছিলেন। আসলে এটা ছিল সামেরী নামক এক মুনাফেকের কাজ। হযরত হারূন এথেকে তাদের বিরত করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেন নি। সূরা তা-হা'র ৪ রুকূতে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কায় বিস্তারিত বিবরণ থেকে ক্ষান্ত থাকলাম।

## হযরত ইসমাঈলের কুরবানী ঃ বাইবেলের ভিন্ন মত

হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) কাকে কুরবানী দিয়েছিলেন এ প্রসঙ্গে বাইবেল ও কুরআনে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। বাইবেল বলে ঃ

"তখন তিনি কহিলেন, তুমি আপন পুত্রকে, তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে, যাহাকে তুমি ভালবাস, সেই ইসহাককে

লইয়া মোরিয়া দেশে যাও, এবং তথাকার যে এক পর্বতের কথা আমি তোমাকে বলিব তাহার উপর তাহাকে হোমার্থে বলি দান কর।” (আদি পুস্তক ২২ ঃ ২)।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের ভাষ্য হলো ঃ

“এরপর সেই পুত্র যখন তার সাথে দৌড়াবার বয়সে উপনীত হলো তখন সে বললো, ‘হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি যেন তোমাকে জবাই করছি। অতএব তুমি চিন্তা কর তোমার কি অভিমত?’ সে বললো ‘হে আমার পিতা! তুমি যা আদিষ্ট হয়েছ তা-ই কর। ইনশাআল্লাহ্ তুমি আমাকে ধৈর্যশীলদের মাঝে (দেখতে) পাবে” (সূরা সাফ্ফাত ঃ ১০৩)।

বাইবেলের মতে হযরত ইবরাহীম (আ.) কুরবানী করেছিলেন হযরত ইসহাককে। কিন্তু কুরআন বলে কুরবানীর পাত্র ছিলেন হযরত ইসমাঈল। বাইবেলের ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর অদ্বিতীয় পুত্রকে কুরবানী করেছিলেন। আসলে ইসহাকের চাইতে ইসমাঈল ১৩ বছরের বড়। কেননা, ‘আব্রামের ছেয়াশী বৎসর বয়সে হাগার আব্রামের নিমিত্তে ইসমায়েলকে প্রসব করেন’ (আদি পুস্তক ১৬ ঃ ১৬) এবং ‘আব্রাহামের একশত বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র ইসাহাকের জন্ম হয়।” (আদিপুস্তক ১১ ঃ ৫)। অতএব হযরত ইব্‌রাহীমের (আ.) অতি বৃদ্ধ বয়সে প্রথম যে পুত্র হয় তার নাম ইসমাঈল এবং ১৩ বছর পর্যন্ত তিনিই অদ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। আর প্রথম ও একমাত্র পুত্র হিসেবে হযরত ইসমাঈল হযরত ইব্‌রাহীমের অতি আদরের সন্তান ছিলেন। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইসমাঈলকেই (আ.) কুরবানী দেয়ার জন্যে হযরত ইব্‌রাহীমকে (আ.) আদেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি তা যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। ইব্রাহীমি এই সুন্নত পালনার্থে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম প্রতি বছর হজ্জের সময় কুরবানী করতেন আর তাঁর (সা.) অনুকরণে বিশ্ব মুসলিমও তা করে থাকে। কিন্তু বনী ইসরাঈল এ ধরনের কুরবানী করে না বা তাদের মাঝে এর কোন প্রচলন নেই বা দেখা যায় না। এত বড় একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে তারা বেমালুম ভুলে বসেছে।

সুতরাং নিঃসন্দেহে হযরত ইব্রাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.)কে কুরবানী করতে উদ্যত হয়েছিলেন ইসহাককে (আ.) নয় যেভাবে বাইবেল বলে থাকে।

কুছ তো খওফে খুদা কারো লোগো
কুছ তো লোগো খুদা সে শারমাও ॥
(হে লোক খোদাকে কিছুটা তো ভয় কর,
হে লোক খোদাকে কিছুটা তো সমীহ কর ॥)

—দুররে সামীন

(চলবে)

## খিলাফত জুবিলী উদযাপনের বছরে আপনি নেযামে ওসীয়্যতে শামিল হয়েছেন কী !

*হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহ্ তাআলা বেনাসরিহিল আযীয নেযামে ওসীয়্যতের প্রতি জামাআতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ঃ*

**“......আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে আর উত্তম পরিণতি পাওয়ার জন্য আরো একটি উপায় রয়েছে যা তোমাদের সৎকর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখতে ও পবিত্র পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক হবে বরং এ অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ এক ব্যবস্থাপত্র, যদ্বারা আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত ধর্মের প্রচার-প্রসার ও বিস্তার লাভের উপায় উপকরণের উদ্ভব ঘটবে এবং হুকুকুল ইবাদ (সৃষ্টির সেবা)-এর পবিত্র দায়িত্ব পালন করাও সম্ভবপর হবে আর তাহলো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জারিকৃত ‘ওসীয়্যত ব্যবস্থা’ ....**

**........আমার আকাঙ্ক্ষা এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাক ও ২০০5 নাগাদ এই নেযামের শত বছর যখন পূর্ণ হয়ে যাবে তখন যেন ১৫ হাজার নতুন ওসীয়্যতকারী এতে অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি আরো প্রত্যাশা করছি ২০০৮-এ নেযামে খিলাফতের শতবর্ষ পূর্তিকালে বিশ্বের প্রতিটি দেশে জামাআতের চাঁদাদাতা সদস্যগণের কমপক্ষে ৫০ ভাগ সদস্য যেন এমন হয় যারা ‘নেযামে ওসীয়্যতে’ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে।”**

*যুগ খলীফার পবিত্র আকাঙ্ক্ষা পূরণে আপনি এতে যোগদান করেছেন কী? না করে থাকলে রমযানুল মুবারকের কল্যাণ থেকে অধিকতর আশিস লাভ করতে খলীফাতুল মসীহ্‌র আহ্বানে সাড়া দিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চির সবুজ ও ফলদায়ী এই তাহরীক পালনে তৎপর হোন।*

# প্রসঙ্গ ঃ রোযা

মাহমুদ আহমদ সুমন

বর্ষ পরিক্রমায় প্রতি বছর মুসলিম উম্মাহর দরজায় আত্মসংযম, আত্মোপলব্ধি, তাক্ওয়া এবং মহান কুরবানীর শিক্ষা নিয়ে উপস্থিত হয় পবিত্র রমযান মাস। পবিত্র মাহে রমযান আধ্যাত্মিক ভুবনে বসন্তের সমারোহে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আত্ম-শুদ্ধির মাস, পরম করুণাময় আল্লাহ্কে একান্ত করে পাওয়ার মাস। এই পবিত্র মাসের পুরস্কার ঘোষণা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলা হযরত রসূল করীম (সা.)কে হাদীসে কুদসীতে জানিয়েছেন –'মানুষ যত কাজ করে তা তার নিজের জন্য আর রোযা রাখা হয় কেবল আমার জন্য। সুতরাং আমি নিজেই এর পুরস্কার বা আমি নিজে এর পুরস্কার দিব। তাই বিষয়টা গভীর ভাবে ভাবা উচিত, যার পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ্ নিজে। আমরা আল্লাহ্কে যাদি পেয়ে যাই তাহলে আর কোন কিছুর কি প্রয়োজন রয়েছে? রোযার ইতিহাস তাৎপর্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

**"হে যারা ঈমান এনেছ তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে করে তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার"**

### রোযার প্রাথমিক ইতিহাস ঃ

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত দার্শনিক স্পেন্সার নিজের বই Principles of Sociology -তে কতগুলো বন্য সম্প্রদায়ের উদাহরণ এবং জীব বৃত্তান্তের ওপর গবেষণা করে লিখেছেন যে, রোযার প্রাথমিক মানদন্ড এভাবেই হয়তো হয়ে থাকবে যে আদিম বন্য যুগের মানুষ স্বভাবতঃই ক্ষুৎ-পিপাসায় আক্রান্ত থাকতো এবং তারা মনে করতো যে, আমাদের আহার্য বস্তু আমাদের পরিবর্তে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৃতদের নিকট পৌঁছে যায়। কিন্তু অনুমানসিদ্ধ উপাত্তকে যুক্তি ও বুদ্ধির আওতাভুক্ত লোকেরা কখনো স্বীকার করে নেয় নি। (ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ঃ ১০ম খন্ড ১৯৪ পৃষ্ঠা একাদশ সংস্করণ) মোট কথা অংশীবাদী ধর্মমতগুলোতে রোযার প্রারম্ভ এবং হাকীকতের যে কোন কারণেই হোক না কেন ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রাথমিক পর্যায় ও শেষ পর্যায়কে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে নিজের অনুসারীদের ওকালতির প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করে না। ইসলামের মূল উৎস কুরআন করীমে উদাত্ত কন্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে, "হে যারা ঈমান এনেছ তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে করে তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৪)

অপর এক আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন, "রমযান মাস হচ্ছে সেই মাস যার মাঝে কুরআন করীম নাযেল করা হয়েছে। যা মানুষের জন্য পরিপূর্ণ হেদায়াত, পথ প্রদর্শনের দলিল এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে এই মাসকে পাবে তাকে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। আর যদি কেউ রুগ্ন হয় অথবা সফরে থাকে তাহলে সে সমপরিমাণ রোযা অন্যান্য দিনসমূহে আদায় করবে। আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্র মহিমা কীর্তন কর এইজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৬)।

এই পবিত্র আয়াতসমূহে শুধু কেবল রোযার কতিপয় আহ্কামই বর্ণনা করা হয়নি; বরং রোযার ইতিহাস, রোযার হাকীকত, রমযানের বিশেষত্ব এবং রোযার প্রতি আরোপিত অভিযোগসমূহের প্রত্যুত্তরসমূহ বিস্তারিতভাবে এবং চিত্তাকর্ষকরূপে বিবৃত করা হয়েছে।

### রোযার ধর্মীয় ইতিহাস ঃ

কুরআন করীমের উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহের সুস্পষ্টভাবে এই কথা তুলে ধরা হয়েছে যে, বর্তমান ইসলামের সাথেই শুধু কেবল রোযার সম্পৃক্ততা সুনির্দিষ্ট নয়, বরং কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়ার পূববর্তী মাযহাবগুলোতেও রোযাকে একটি ধর্মের বিশেষ অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অন্ধকার যুগের আরবদের সামনে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম উদাত্তকন্ঠে ঘোষণা করলেন, পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম বিশ্বাসের মাঝে রোযা অবশ্যই ফরজ ইবাদত হিসেবে পরিগণিত ছিল। কিন্তু তৎকালিন আরবের বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায় এমনকি বর্তমান যুগের কোন কোন পন্ডিত

ব্যক্তিরাও মনে করে যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর দাবী যদি সর্বাংশে সত্য ও যথার্থ বলে প্রতিপন্ন হয় তাহলে এ কথা মেনে নিতে দ্বিধা সংকোচের অবকাশ মোটেই থাকবে না যে, তিনি উপাদানভিত্তিক জ্ঞানবেত্তার উর্দ্ধ ও পরিমন্ডলে অবশ্যই অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দাবীর সত্যতা প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে ইউরোপের অধিক প্রামাণ্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করছি যা অনুসন্ধানীদের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকবে। ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকায় রোযার প্রবন্ধ লেখক উল্লেখ করেছেন যে, "রোযার বিধি-বিধান ও আদায় পদ্ধতি, আবহাওয়া, সামাজিক ব্যবস্থা এবং সভ্যতা বিবর্তনের দরুন যদিও বিভিন্ন রূপ পরিদৃষ্ট হয় তথাপি আমরা অতি কষ্টে এমন কোন ধর্মের নাম উপস্থাপন করতে পারব না, যেখানে রোযাকে ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করা হয়নি.....বস্তুতঃ রোযা একটি ধর্মীয় প্রথা হিসেবে সকল স্থানে স্বীকৃত আছে"।

**অন্তর সমূহের কলুষতা ও অপবিত্রতাকে দোয়া এবং রোযা ছাড়া দূর করার কোন ব্যবস্থা নেই**

ভারতবর্ষকে ধর্ম বিকাশের সবচেয়ে পুরাতন স্থান হিসেবে দাবী করা হয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, বর্ত বা ব্রত অর্থাৎ রোযা থেকে এখানকার ধর্মগুলোও বিমুক্ত ছিল না। ভারতীয় বর্ষপঞ্জিতে প্রতিমাসের ১১ ও ১২ তারিখে ব্রাহ্মণদের ওপর একাদশীয় রোযা অপরিহার্য ছিল। এই হিসেব অনুসারে বার মাসে সর্বমোট ২৪টি রোযা পাওয়া যায়। কোন কোন ব্রাহ্মণ কার্তিক মাসে প্রত্যেক সোমবারে রোযা ব্রত পালন করে। হিন্দু যোগীরা চিল্লা পালন করে অর্থাৎ তারা চল্লিশ দিন পর্যন্ত পানাহার বর্জন করে উপোস থাকার প্রচেষ্টা চালায়। ভারতবর্ষের সকল ধর্মমতে বিশেষ করে জৈন ধর্মের মাঝে রোযা পালনের শর্তাবলী অত্যন্ত কঠিন। তাদের মতানুসারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত একটি রোযা প্রলম্বিত হয়। গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্যে প্রতি বছর জৈন ধর্মের অনুসারীরা কয়েক সপ্তাহ যাবৎ রোযা ব্রত পালন করে। প্রাচীন মিশরীয়দের মঝেও রোযাকে অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। গ্রীক ধর্মানুসারীদের মাঝে শুধু কেবল মহিলারা 'থাসমো ফেরিয়া-এর তৃতীয় তারিখে রোযা রাখতো। পার্শিয়ান ধর্মে যদিও সাধারণ অনুসারীদের ওপর রোযা ফরজ নয় কিন্তু তাদের ইলহামি কিতাবের একটি শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাদের ওপর রোযার হুকুম প্রযোজ্য ছিল। বিশেষ করে ধর্মীয় নেতাদের জন্য পাঁচ বছর রোযা রাখা আবশ্যক ছিল। (ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকা ঃ ১০ম খন্ড, ১৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা, একাদাশ সংস্করণ)

ইহুদীদের মাঝেও রোযা ছিল আল্লাহ্র আরোপিত ফরজ ইবাদত। হযরত মূসা (আ.) তুর পর্বতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ক্ষুৎ-পিপাসায় অতিবাহিত করেছেন। (নির্গমন ঃ ৩৪-৩৮) সুতরাং সাধারণভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারীদের মাঝে চল্লিশ রোযা রাখাকে উত্তম বলে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু তাদের ওপর চল্লিশতম দিনে রোযা রাখা ফরজ বা তাদের সপ্তম মাসের (তাশরিন) দশম তারিখ পড়ত। (তৌরাত ঃ সফরুল আহবার ঃ ১৬-২৯-৩৪ ঃ ২৩-২৭) এজন্য এই দশম দিনকে আশুরা বলা হতো। আর আশুরার এই দিনটি ছিল ঐ দিন যেদিন হযরত মূসা (আ.)কে তৌরাতের ১০ আহকাম দান করা হয়েছিল। এইজন্য তৌরাত কিতাবে এই দিনের রোযাকে পালন করার প্রতি জোর তাগিদ করা হয়েছে।

বস্তুতঃ উপরোল্লিখিত দিক-নির্দেশনা ছাড়া ইহুদীদের অন্যান্য ছহীফাসমূহের মাঝে অন্যান্য দিনের রোযার হুকুম-আহকামও বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। (প্রথম শামুয়েল ৭-৬ এবং ইয়ারমিয়া ৩৬-৬)।

খৃষ্টান ধর্মে বর্তমান কালেও রোযার প্রভাব বিদ্যমান। হযরত ঈসা (আ.)ও চল্লিশ দিন পর্যন্ত জঙ্গলে অবস্থান করে রোযা রেখেছেন। (মথি ঃ ৪-২) হযরত ইয়াহইয়া (আ.) যিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর সমসাময়িক ছিলেন তিনিও রোযা রাখতেন এবং তার উম্মতগণের মাঝেও রোযা রাখার রীতির প্রচলন ছিল। (মার্কস ঃ ২-১৮) ইহুদীরা বিভিন্নকালে অসংখ্য ঘটনাবলীর স্মৃতিস্বরূপও এর সাথে অনেকগুলো রোযা সংযোজন করেছিল। এর অধিকাংশই ছিল বেদনাময় স্মৃতির স্মরণিকা। এই সকল রোযার মাধ্যমে তারা নিজেদের অতীত বেদনাময় স্মৃতিগুলোকে উজ্জীবিত করে তুলতো। এমন কি দেহ-মনের মাঝেও বেদনা ছাপ ফুটিয়ে তুলতো। (কুযাত ঃ ২০-২৬, প্রথম শামুয়েল ঃ ৭-৬ ও ৩১-১৩ এবং লুক ঃ ৬-১৬)।

হযরত ঈসা (আ.) স্বীয় আমলে কিছু সংখ্যক রোযা রাখার অনুমতি বা অবকাশও ছিল। একবার কতিপয় ইহুদী

সমবেত হয়ে হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট এই আপত্তি উত্থাপন করলো যে, তোমার অনুসারীরা কেন রোযা রাখছে না। হযরত ঈসা (আ.)-এর জবাবে বলেন, "তবে কি বরযাত্রীগণ যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে অবস্থান করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত রোযা রাখতে পারে না। সুতরাং এমন এক সময় আসবে যখন বর তাদের সাথে থাকবে না তখন তারা রোযা রাখবে।" (মার্ক ঃ ২-১৮)

এই দিক নির্দেশনায় বর বলতে নির্দেশ করা হয়েছে হযরত ঈসা (আ.)-এর পবিত্র সত্তাকে এবং বরযাত্রী বলা হয়েছে তার অনুসারী হাওয়ারীদেরকে। একথা সুস্পষ্ট যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন স্বীয় উম্মতের মাঝে অবস্থান করেন ততক্ষণ উম্মতদের শোক পালনের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় না। সুতরাং উপরোল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) হযরত মূসা (আ.) এর আমলে প্রবর্তিত ফরজ এবং মোস্তাহাব রোযাসমূহকে নয়; বরং শোক পালনার্থে প্রচলিত নব্য রোযার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন এবং তিনি স্বীয় অনুসারীদেরকে পূর্ণ আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধচিত্ততার সাথে রোযা রাখার উপদেশ প্রদান করতেন। যেমন 'অতঃপর তোমরা যখন রোযা রাখবে তখন লোক দেখানো মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষের মত নিজেদের মুখমন্ডলকে উদাস করে রাখবে না। কেননা, এই শ্রেণীর লোক নিজেদের মুখমন্ডলের আসল রূপ বিকৃত করে ফেলে যেন মানুষ মনে করে যে তারা রোযাদার। আমি তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলছি। এ শ্রেণীর লোকেরা তাদের বিনিময় পেয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা যখন রোযা রাখবে তখন মাথায় তেল ব্যবহার করবে, মুখমন্ডল ধৌত করবে। এতে করে তোমরা মানুষের নিকট নয়; বরং তোমাদের পিতার নিকট গোপনীয় ভাবে অবস্থান করবে। তোমরা যারা রোযাদার তা সুস্পষ্ট এবং তোমাদের পিতার নিকট যা প্রচ্ছন্ন ও গোপনীয় তিনি তার সরাসরি প্রতিফল ও বিনিময় অবশ্যই প্রদান করবেন' (মথি ঃ ৬ ঃ ৬-৭)।

অপর এক স্থানে হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট তার অনুসারীরা জিজ্ঞেস করলো যে আমরা আমাদের অপবিত্র অন্তর সমূহকে কিভাবে দূর করে দিতে সক্ষম হবো? প্রত্যুত্তরে হযরত ঈসা (আ.) বললেন, অন্তর সমূহের কলুষতা ও অপবিত্রতাকে দোয়া এবং রোযা ছাড়া দূর করার কোন ব্যবস্থা নেই (মথি ঃ ১৭-২১)।

আরববাসীরাও ইসলামের পূর্বে রোযা সম্পর্কে কমবেশী ওয়াকিফহাল ছিল। মক্কার কুরাইশগণ অন্ধকার যুগে আশুরার (অর্থাৎ ১০ মহররম) দিনে এ জন্য রোযা রাখতো যে, এই দিনে খানা কাবার ওপর নতুন গেলাফ চড়ানো হতো। (মুসনাদে ইবনে হাম্বল ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ২৪৪)

মদীনায় বসবাসকারী ইহুদীরাও পৃথকভাবে আশুরা উৎসব পালন করতো। (সহীহ বুখারী ঃ কিতাবুস সওম, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬২) অর্থাৎ ইহুদীরা নিজেদের গণনানুসারে সপ্তম মাসের ১০ম দিনে রোযা রাখতো।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, কুরআন করীমের নির্দেশ "তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল" আয়াতটি ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। একমাত্র ইসলাম ধর্মেই এই উপবাস ব্রতের মধ্যে নবরূপ ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য তুলে ধরেছে। ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম। তাই ইসলামেই রোযাকে সঠিক ভাবে মূল্যায়ণ করে একে পালনের জন্য ফরজ করা হয়েছে এবং এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

## রোযার হাকীকত

মানুষের সকল প্রকার আত্মিক অবনতি ও দুর্ভাগ্যসমূহকে এবং তার অসফলতার কার্যকারণসমূহ যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে সর্বশেষ পরিণাম ফল এই দাঁড়াবে যে, পৃথিবীর বুকে মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজন সমূহের প্রতি মুখাপেক্ষী এবং তারা বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসরণ করে চলে। তাদের অন্তরের যে কোন অনুকম্পন এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাবতীয় সব চেষ্টা ও তদ্বীর কোন প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্য থেকে খালি নয়। নৈতিক অবস্থা যার সার্বিক সম্পর্ক আত্মিক অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি এর তাহকীক করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, এর ভিত্তিও সাধারণত কোন না কোন প্রয়োজন অথবা কামনা-বাসনার উপর অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত। এ জন্য আমাদের সকল প্রকার দুর্ভাগ্য, অপবিত্রতা এ সকল কারণেরই ফলশ্রুতি মাত্র। সুতরাং প্রয়োজন এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি মানুষের সংস্পর্শে থেকে বহু দুরে চলে যায় এমনকি এগুলোর সংস্পর্শ হতে মানুষ যদি সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী ও বিমুক্ত হয়ে যায় তাহলে সে আর মানুষ রূপে বিবেচিত হবে না, বরং তাকে ফেরেশ্‌তা বলাই সমীচীন হবে।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, মানুষের প্রয়োজনসমূহ এবং তাদের বিভিন্নমুখী আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যা একটি বৃহত্তর পরিসরে সীমাহীনরূপে পরিদৃষ্ট হয়

এগুলোর আসল হাকীকত কি? আমাদের অন্তরে রয়েছে আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি খনি এবং ইচ্ছা ও অভিব্যক্তির সুবিশাল প্রান্তর এবং সেখানে অবস্থান করছে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অসংখ্য প্রয়োজনীয়তার অগণিত সম্ভার। এইসব অগণিত আশা আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করে খোদার সন্তুষ্টির জন্য তাঁর কথা মত চলাই আমাদের জন্মের উদ্দেশ্য। আমরা যদি খোদা তাআলার হুকুম মতে চলি তাহলেই তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবো আর রোযা হচ্ছে খোদাকে পাবার সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

হযরত রসূল করীম (সা.) রমযানের ইবাদত সম্পর্কে বলেন, "রমযান মাসের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ্ তাআলা একজন আহ্বানকারী ফেরেশ্তাকে পাঠান, যিনি এসে ঘোষণা দেন, হে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী! সামনে এগিয়ে চল। সামনে এগিয়ে চল। কেউ এমন আছে কি যে দোয়া করে যেন তার দোয়া কবুল করা হয়! কেউ কি ক্ষমা প্রার্থনা করছে যে, তাকে যেন ক্ষমা করা হয়? কেউ কি তওবা করছে যে, তার তওবা যেন কবুল করা হয়?" (কানযুল উম্মাল)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রোযার হাকীকত সম্বন্ধে বলেন, "অল্প আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করাও আত্মশুদ্ধির জন্য আবশ্যক। এতে দিব্য-দর্শন শক্তি (কাশ্ফী তাকত) বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু খাদ্য গ্রহণ করে বাঁচে না যে অনন্ত জীবনের প্রতি লক্ষ করা একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে নিজের ওপর "ঐশীকোপ" (কহরে ইলাহী) আনয়ন করে। কিন্তু রোযাদারকে লক্ষ রাখতে হবে যে, রোযার অর্থ শুধু এটা নয় যে, মানুষ অনাহারে থাকবে; বরং খোদার যিকর অর্থাৎ তাঁর স্মরণে মশগুল থাকা উচিত। আঁ হযরত (সা.) রমযান শরীফে অনেক বেশি ইবাদত করতেন। এদিনগুলোতে পানাহারের চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ (তাবাত্তুল ইলাল্লাহ্) করা চাই। দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির, যে দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্য পরওয়া করে না। বাহ্যিক খাদ্য দৈহিক শক্তি লাভ হয়, একই ভাবে আধ্যাত্মিক খাদ্য আত্মাকে কায়েম রাখে এবং এতে আত্মার শক্তিগুলো সতেজ হয়। খোদার নিকট সাফল্য চাও। কারণ, তিনি সামর্থ্য দিলেই সকল দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে"। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন, "কেবল অভুক্ত ও পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নয় বরং এর একটি তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে যা অভিজ্ঞতায় বুঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মাঝেই এটা নিহিত আছে যে, মানুষ যত কম খায় ততই তার আত্মশুদ্ধি এবং কাশফী তাকত বা দিব্য-দর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়। খোদার অভিপ্রায় এটাই যে, একটি খাদ্যকে কম করে অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। রোযাদারের সর্বদাই এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য। খোদা তাআলার যিকর বা স্মরণেই সময় কাটানো উচিত যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব, রোযার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে। এটা আত্মার প্রশান্তির এবং তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু খোদার জন্যই রোযা রাখে এবং আচার-অনুষ্ঠানের রোযা রাখে না তার উচিত, যে সর্বদা হাম্দ (প্রশংসা কীর্তন), তসবীহ্ (আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মাহাত্ম ঘোষণা) এবং তাহলীলের (আল্লাহ্র তৌহীদ ঘোষণা) মাঝে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাতে তার দ্বিতীয় খাদ্যের (আধ্যাত্মিক খাদ্যের) সৌভাগ্য লাভ হয়"। (আল হাকাম, ১৭-০১-১৯০৭)

**রোযাদারকে লক্ষ রাখতে হবে যে, রোযার অর্থ শুধু এটা নয় যে, মানুষ অনাহারে থাকবে; বরং খোদার যিকর অর্থাৎ তাঁর স্মরণে মশগুল থাকা উচিত। আঁ হযরত (সা.) রমযান শরীফে অনেক বেশি ইবাদত করতেন। এদিনগুলোতে পানাহারের চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ (তাবাত্তুল ইলাল্লাহ্) করা চাই। দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির, যে দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্য পরওয়া করে না।**

রোযার গুরুত্ব সম্পর্কে রেওয়ায়েত আছে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, "প্রত্যেক জিনিষের জন্য নির্দিষ্ট দরজা থাকে, ইবাদতের দরজা রোযা" (জামেউস সাগীর)। তারপর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, "রোযা ঢালস্বরূপ এবং আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি নিরাপদ দূর্গ" (মুসনাদ আহমদ)। হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেছেন, আমরা হযরত ওমর (রা.) নিকট বসেছিলাম, হযরত ওমর জিজ্ঞাসা করলেন, ফেৎনা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্পর্কে তোমাদের কাছে আঁ হযরত (সা.)-এর দেয়া কোন বক্তব্য আছে? আমি বললাম, আঁ হযরত (সা.) যা

বলেছিলেন আমার তা হুবহু মনে আছে। হযরত ওমর বললেন, 'তুমি কথা বলার ব্যাপারে খুব সাহস রাখ। আমি বললাম, মানুষ তার ঘর-সংসার, ধন-সম্পদ, সন্তানাদী অথাবা প্রতিবেশির পক্ষ থেকে যেসব ফেৎনার সম্মুখীন হয়, নামায, রোযা, সদকা, ভাল কাজের আদেশ, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার নির্দেশ পালনের মাধ্যমে ঐসব ফেৎনার প্রায়শ্চিত্য হয়ে যায়' (বুখারী)।

হযরত আবু মাসুদ গাফফারী (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি একদিন আঁ হযরত (সা.)কে বলতে শুনেছি তখন রমযান মাস ছিল, হুযূর (সা.) বলেছিলেন, যদি মানুষ রমযানের মর্যাদা, ফযিলত সম্পর্কে জানত তাহলে আমার উম্মতের সবাই আকাঙ্ক্ষা করতো যে সারা বছরটাই যেন রমযান হয়ে থাকে। একথা শুনে বনী খুজাআ গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি রমযানের ফযিলত সম্পর্কে বলুন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, নিশ্চয় জান্নাতকে বছরের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত রমযানের জন্য প্রস্তুত করা হয়। রমযানের প্রথম দিন আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র আরশের নিচে বায়ু প্রবাহ শুরু হয়ে যায়।

হাদীসে আরো বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রা.) রেওয়ায়াত করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "রমযান মাসে আল্লাহ্‌র যিকর যারা করেন তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়, এ মাসে আল্লাহ্‌র কাছে চেয়ে কেউ বঞ্চিত থাকে না"। আঁ হযরত (সা.) এ কথাও বলেছেন, "রোযাদার ব্যক্তি ইফতারী করার সময় যা দোয়া করে তা কখনোই না মঞ্জুর হয় না" (ইবনে মাজাহ্)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রা.) বলেছেন ঃ "যদি মানুষে জিজ্ঞেস করে যে, রোযার দ্বারা কিভাবে নৈকট্য লাভ হয়! তুমি বল, আমি খুব নিকটে এবং এ মাসে যারা দোয়া করে তাদের দোয়া শুনে থাকি। তাদের উচিত তারা যেন আগের থেকে আমার আদেশ নিশেধ মেনে চলে যা আমি আদেশ দিয়ে রেখেছি। আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যেন সে উদ্দেশ্য লাভে সফল হতে পারে এবং এভাবে সে অনেক উন্নতি করবে" (আল হাকাম, ১৭ নভেম্বর, ১৯০৭)।

**মানুষ যদি রমযানের মর্যাদা, ফযিলত সম্পর্কে জানত তাহলে আমার উম্মতের সবাই আকাঙ্ক্ষা করতো যে সারা বছরটাই যেন রমযান হয়।**

তিনি (রা.) আরো বলেন, "রোযা যেমন তাক্ওয়া লাভের মাধ্যম তেমনই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভেরও মাধ্যম। তাইতো রমযানের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ "এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল) আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার ওপর ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।"

(সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)

এ আয়াতে রমযানের বরকত সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এখান থেকে রমযান মাসের সম্মান এবং আল্লাহ্ যে দোয়া শুনেন ও কবুল করেন এ সম্পর্কে জানা যায়, বলা হয়েছে যদি কেউ এ মাসে দোয়া করে তাহলে আমি কবুল করবো। কিন্তু তার উচিত আমার কথা মেনে চলা এবং মান্য করা। মানুষ যত বেশি আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে শক্তি ব্যয় করে আল্লাহ্ ও তত বেশি তার দোয়া কবুল করেন। তারপর আয়াত শেষে যে বলা হয়েছে, "যেন তারা হেদায়াত পায়"–এর থেকে জানা যায় যে, হেদায়ত লাভ করাও এ মাসের বরকত। এ মাসে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, তাঁর নির্দেশাবলীর আনুগত্য এবং দোয়ার মাধ্যমে হেদায়াত লাভ হয় এবং এর দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়" (আল হাকাম, ২৪ জানুয়ারী ১৯০৪)।

আল্লাহ্ তাআলা রোযাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধকে খুব পছন্দ করেন আর এ জন্য পছন্দ করেন যে, তাঁর বান্দা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে রোযা রাখতে বাধ্য করেছে এবং ইবাদতে রত হয়েছে। ফলে আল্লাহ্ তাঁর এমন বান্দাকে খুব পছন্দ করেন। এমন বান্দাদের জন্য বিশেষ রহমত ও ফযলের বাতাস প্রবাহিত করেন। ইহজগতেও তাকে নিজের আশ্রয়ে রাখেন এবং পরকালেও জান্নাতের উত্তরাধিকারী করেন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন, আমরা যেন সঠিকভাবে এই পবিত্র রমযান ইবাদতগুজারে অতিবাহিত করতে পারি। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এ রমযানের সীমাহীন কল্যাণ প্রদান কর। প্রত্যেক অনিষ্ট, মন্দ থেকে বাঁচাও, তোমার রহমতের ও ফযলের আবরণের মধ্যে চিরদিন আবৃত করে রাখ। (আমীন)

# সফরে এবং অসুস্থতায় রোযা পালন সম্পর্কিত নির্দেশনা

সংকলন ঃ **রইস আহমদ**, মুরব্বী সিলসিলাহ্

ইসলাম ধর্ম হচ্ছে প্রাকৃতিক এবং এর সমস্ত বিধি বিধান পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের ফিতরত এবং চরিত্রের দিকে দৃষ্টি রেখে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন। অপর দিকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সুন্নত দ্বারা সেই বিধি বিধানের উপর আমল করে আমাদেরকে শিখিয়েছেন। আর আঁ হযরত (সা.)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণকারী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও নিজের জীবনে আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নতের উপর আমল করে আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

রোযা সম্বন্ধে আঁ হযরত (সা.)-এর সমস্ত নির্দেশ হাদীসে বর্ণিত আছে। যার ওপর তিনি আমল করেছেন এবং আমল করিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য যে, সাধারণ মানুষ এই বিধিবিধান ছেড়ে দিয়ে নিজের ওপর এমন বিধান তৈরী করে নিয়েছে যা কুরআন এবং হাদীসের বিরোধী। – সফরে অথবা অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখা, সাবালক হওয়ার আগে শিশুদের রোযা রাখতে বাধ্য করা, গর্ভবতী এবং স্তনদানকারী মহিলাদের রোযা রাখা। সমাজের এক প্রকার আলেমধারী লোক সাধারণ মানুষকে শুধু এ জন্য এই ধারণা থেকে বাধা দেন না যে কোথাও যেন তাদের সম্মান না যায়। বিশেষ করে গয়ের আহমদীদের মধ্যে বংশ পরাম্পরায় ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে এই শিক্ষা জারী আছে। আল্লাহ্ তাআলার শুকুর যে, হযরত আকদাস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ (আ.) হাকামান এবং আদলান হয়ে এসেছেন এবং তিনি এই সমস্ত অ-স্বভাবজাত এবং বেদাত থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দিয়েছেন। রোযার আয়াতে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বলেছেন, **ইয়ুরিদুল্লাহু বিকুমুল ইয়ুসরা ওয়ালা ইয়ুরিদু বিকুমুল উসরা"** (সূরা বাকারা ঃ ১৮৬)।

অর্থাৎ – আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্য সহজ চান আর তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে চান না।" রোযা সম্পূর্ণভাবে রহমত, কিন্তু আফসোসের কথা মুসলমান কিছু আলেম সমাজের অজ্ঞানতা এবং মূর্খতার দরুন এই রোযাকে কষ্টদায়ক বানিয়ে নিয়েছে। আর কিছু লোক তো রোযা সম্বন্ধে এত শিথীলতা করেছে যে, তাদের রমযানের ব্যাপারে কোন পরওয়া নাই। রমযানুল মোবারক মাস আসে আর তার ফজল ও রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করে চলে যায়। কিন্তু তাদের খবর পর্যন্তও থাকে না যে, রমযান আসলো এবং চলে গেল। আর কিছু লোক এর মধ্যে কট্টরতা অবলম্বন করে। সমস্ত রোযাকে তারা ইসলাম মনে করে। আর সমস্ত অসুস্থ, দুর্বল, বৃদ্ধ, গর্ভবতী, স্তনদানকারী এবং শিক্ষার্থীর জন্যও তারা বিশ্বাস রাখে যে, তারা যেন অবশ্যই রোযা রাখে এবং যে অবস্থাতেই হোক। যদিও অসুস্থতা বেড়ে যায় অথবা স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে।

**যে ব্যক্তি অসুস্থ এবং মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখে সে খোদা তাআলার স্পষ্ট হুকুমের অস্বীকার করে। খোদা তাআলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন অসুস্থ এবং মুসাফির যেন রোযা না রাখে।**

ইসলাম শান্তির ধর্ম। কখনই এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, মানুষকে তার সফলতার পথ থেকে সরিয়ে দিবে। তবে ইসলাম নিজের কিছু বিধি বিধানের এমন কিছু শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, যদি এই শর্ত কারো মধ্যে পাওয়া যায় তবে সে যেন এই হুকুমের ওপর আমল করে আর যদি না পাওয়া যায় তবে যেন না করে। যেমন হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির বিধি বিধান। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **"ওয়া মান কানা মারিজান আও আলা সাফারিন ফা ইদ্দাতুম মিন আইয়্যামিন উখার ইয়ুরিদুল্লাহু বিকুমুল ইয়ুসরা ওয়ালা ইয়ুরিদু বিকুমুল উসরা"**

(সূরা বাকারা ঃ ১৮৬)

অর্থাৎ – আর যে অসুস্থ অথবা মুসাফির হয় তা হলে সে যেন অন্য দিন গণনা পূর্ণ করে। আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ চান কঠিন চান না"।

অসুস্থ এবং মুসাফিরদের রোযা রাখার বিধি বিধান সম্বন্ধে এই যুগের হাকামান আদলান সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি অসুস্থ এবং মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখে সে খোদা তাআলার স্পষ্ট হুকুমের অস্বীকার করে। খোদা তাআলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন অসুস্থ এবং মুসাফির যেন রোযা না রাখে। অসুস্থ সুস্থ হলে, মুসাফির সফর শেষ হলে রোযা রাখবে। খোদার

এই হুকুমের ওপর আমল করা উচিত কেননা নাজাত ফজলের ফলে হয়। নিজের আমলের জোর দেখিয়ে কেউ নাজাত পেতে পারে না। খোদা তাআলা এটা বলেন নি যে, অসুস্থতা ছোট অথবা বড় আর সফর ছোট অথবা বড় বরং হুকুম সাধারণ ভাবে। আর এর উপর আমল করা উচিত। অসুস্থ এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তার ওপর আদেশ ভঙ্গের ফতওয়া অবশ্যই লাগবে। (বদর, ১৭ অক্টোবর ১৯০৭, ফিকাহ্ আহমদীয়া ২৯০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, রমযান মাসে সফর করা অবস্থায় রোযা রাখা প্রকৃত পক্ষে যদি আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করেন তবে দেখবেন এতে নেকী নাই। কেননা মানুষ রমযান মাসে সহজভাবে রোযা রাখে আর যদি রমযানের পরে রোযা আলাদা ভাবে রাখতে হয় তবে বুঝা যায় যে, কঠিন কাজ ছিল। কিছু লোক নেকীর বাহানায় সহজ চায়। আর বলে যে, রোযাকে টালবাহানা করে যতগুলো চলে যায় যাক তা না হলে পরে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে। তো যাই হোক আল্লাহ্ অন্তরকে জানেন এই জন্য আল্লাহকে ধোকা দেওয়া যাবে না"।

হুযূর (রাহে.) আরো বলেন, 'আপনি দ্বিতীয়বার বিশ্লেষণ করে দেখেন আপনি এটা জানতে পারবেন যে অধিকাংশ সফরে রোযারাখাকারী এই জন্য রোযা রাখে যে, এখন রমযান মাস চলছে সবাই রোযা রাখছে আমিও রেখে নেই। পরে কে রাখবে।

কিছু পিতা মাতা তাদের ছোট ছোট শিশুকে রোযা রাখান আর তার পর গর্ববোধ করে বলে যে, আমার বাচ্চা এতগুলো রোযা রেখেছে, তাদের রোযা রাখানোর উদ্দেশ্য এটাই যে, পরে তারা ঘোষণা দিতে পারে। আসলে এটা বাচ্চাদের যুলুমের উপর যুলুম আর রোযা থেকে তাকে ঘৃণা এবং সামনে অস্বীকৃতি করার সমার্থক।

স্তনদানকারী এবং গর্ভবতীর সম্বন্ধে তো আঁ হযরত (সা.)-এর বাণীই আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে রোযা থেকে অবকাশ দিয়েছেন।

হাদীসে এসেছে, আঁ হযরত (সা.) বলছেন, 'আল্লাহ্ তাআলা মুসাফেরের জন্য নামায অর্ধেক এবং স্তনদানকারী ও গর্ভবতীর রোযা অবকাশ দিয়েছেন।

রোযা সম্বন্ধে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কিছু নির্দেশনা পেশ করা হলো, হুযূর (রা.) বলেন, কেউ কেউ আছেন যারা ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে রোযা রাখান অথচ প্রত্যেক ফরয এবং হুকুমের জন্য আলাদা আলাদা সীমা এবং আলাদা আলাদা সময় আছে। আমাদের দৃষ্টিতে কিছু বিধিনিষেধের সময় চার বছর বয়স থেকে শুরু। আর কিছু এমন আছে যার সময় সাত বছর থেকে শুরু। আর কিছু এমন আছে যার সময় সাত বছর থেকে বার বছরের মধ্যে। আর কিছু এমন আছে যার সময় ১৫ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। আমার নিকট রোযার হুকুম ১৫ থেকে ১৮ বছরের বাচ্চার ওপর। আর এটাই সাবালক হওয়ার সময় সীমা। ১৫ বছর থেকে রোযা রাখার অভ্যাস করাতে হবে আর ১৮ বছর বয়সে রোযা ফরজ মনে করা উচিত। আমার স্মরণ আছে, যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন আমাদেরও রোযা রাখার শখ হতো, কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রোযা রাখতে দিতেন না। সুতরাং বাচ্চাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য, তাদের শক্তি বাড়ানোর জন্য রোযা রাখা থেকে তাদের বাধা দেওয়া উচিত। তারপর যখন তাদের সময় এসে যায়, যখন তারা নিজেদের শক্তিতে পৌঁছে যাবে যা ১৫ বছর বয়স তখন তাদের রোযা রাখানো হোক। আর সেটাও খুব ধীরের সাথে। প্রথম বছর যতগুলো রাখবে পরের বছর তার থেকে কিছু বেশি আর তৃতীয় বছরে তার থেকে বেশি, এই ভাবে পর্যায়ক্রমে রোযা রাখার অভ্যাস বানানো হোক। (আল ফজল ১১ এপ্রিল ১৯২৫, ফিকাহ্ আহমদীয়া ২৯১ পৃষ্ঠা)

তিনি আরো বলেন, বৃদ্ধ যার শক্তি শেষ হয়ে গেছে আর রোযা তাকে জীবনের বাকী কাজ থেকে বঞ্চিত রাখে তার জন্য রোযা রাখা নেকী নয়। তারপর সেই শিশু যার শক্তি অর্জনের অধ্যায় চলছে আর সামনের ৫০/৬০ বছরের জন্য শক্তি জমা করছে তার জন্যও রোযা রাখা নেকী হতে পারে না। কিন্তু যার মধ্যে শক্তি আছে আর সে রমযান পায় সে যদি রোযা না রাখে তবে সে গুনার ভাগীদার হবে। (আল ফজল, ২ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫, ফিকাহ্ আহমদীয়া ২৯১ পৃষ্ঠা)

রমযান মুসলমানদের দিক থেকে নিজের সত্তা এবং বংশধরের কুরবানীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। রোযা দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করা এবং সত্য স্বপ্নের অভ্যস্ত করা ছাড়াও গরীবদের জীবন সম্বন্ধে অনুভূতি সৃষ্টি করা এবং মু'মিনদের মধ্যে কুরবাণীর রূহকে উন্নতি করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রোযা এক বরকতময় ইবাদত। যাদের রোযা রাখার হুকুম আছে তারা রোযা রাখুন আর যাদের হুকুম নাই যেমন অসুস্থ ও মুসাফির রোযা যেন না রাখে, পরে সুস্থ হলে আর সফর শেষ করে যেন গণনা পূর্ণ করে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে রোযার হুকুমের ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

# ইসলামে পবিত্র রমযানের গুরুত্ব

**লাকী আহমেদ**

শুরু হয়েছে পবিত্র মাহে রমযান। সময়ের সাথে সাথেই প্রতি বছর মহান সাধনার ব্রত নিয়ে এ মাস আমাদের সামনে এসে হাজির হয় এক নতুন আঙ্গিকে। এ মাস সারা বছরের পাপকে ধুয়ে মুছে পরিশুদ্ধ করার মাস; পবিত্র কুরআনের নূরে আলোকিত হবার মাস, বেহেশতী স্পন্দনে আলোরিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টি অন্বেষণে নব উদ্যমে ঝাপিয়ে পড়ার মাস এ পবিত্র রমযান।

রোযা হচ্ছে ইসলামী ইবাদতের তৃতীয় রোকন। আরবী ভাষায় রোযাকে সাওম বলা হয়। যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে চুপ থাকা, বিরত থাকা। কোন কোন বিশ্লেষণ মোতাবেক সাওমকে বলা হয়েছে নিজেকে দৃঢ়তার সাথে নিবৃত্ত রাখা এবং সুদৃঢ় পন্থায় দৈহিক চাহিদাসমূহকে সংযত রাখা। এই অর্থসমূহের দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামী পরিভাষায় রোযার প্রকৃত অর্থ ও মর্ম কি? বস্তুতঃ রোযা হচ্ছে নফসের কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্খা সমূহকে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সংযত রাখা এবং লোভ-লালসার উৎসাহ ব্যঞ্জক রঙ্গিন পরিমন্ডলে নিজের দেহ-মন-প্রাণকে সংযত, সুদৃঢ়ভাবে বিমুক্ত রাখা। ব্যবহারিক জীবনে প্রাত্যহিক কর্মকান্ডের মাঝে সাধারণতঃ নফসানী খাহেসসমূহ এবং মানবিক লোভ-লালসা ও উচ্চাকাঙ্খাসমূহের বিকাশস্থল হচ্ছে তিনটি। যথা, খাদ্য, পানীয় এবং নারী। এই তিনটি উপকরণ এবং উপায় থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দৈহিক ও আত্মিক সম্পর্কসমূহকে সংযত ও সুসংহত রাখার নামই শরীয়ত মোতাবেক রোযা। কিন্তু একই সাথে এ সকল বাহ্যিক কামনা-বাসনাসমূহের সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ কামনা-বাসনা ও অমঙ্গল চিন্তা-ভাবনা হতে অন্তর ও যবানকে হেফাযত রাখার নাম বিশেষ শ্রেণীর নিকট রোযার মর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ওপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হলো, যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার। (২ ঃ ১৮৪)।

> **রমযান মাস সেই মাস যাতে নাযেল করা হয়েছিল কুরআন যা মানবজাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এই মাসকে পায় সে যেন এতে রোযা রাখে।**

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে–রমযান মাস সেই মাস যাতে নাযেল করা হয়েছিল কুরআন যা মানবজাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এই মাসকে পায় সে যেন এতে রোযা রাখে; (২ ঃ ১৮৬)।

হাদীসে বলা হয়েছে–হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাসের আন্তরিকতার ও উত্তম ফল লাভের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে।' (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "সম্মান ও মর্যাদার প্রভু আল্লাহ্ বলেন, মানুষের অন্য সব কাজ তার নিজের জন্য। কিন্তু রোযা একান্তই আমার জন্য এবং আমি এর জন্য তাকে পুরস্কৃত করব।' রোযা ঢালস্বরূপ। তাঁর নামে বলছি যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট কস্তুরীর গন্ধের চেয়েও পবিত্র। একজন রোযাদার দু'টি আনন্দ লাভ করে, সে আনন্দিত হয় যখন সে রোযা ভাঙ্গে এবং রোযার কল্যাণে সে আনন্দিত হয় যখন সে তার প্রভুর সাথে মিলিত হয়" (বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার জন্য শুধুমাত্র রোযা ছাড়া। এটি (রোযা) আমার (আল্লাহ্র) এবং এর প্রতিদান আমি স্বয়ং, রোযা ঢালস্বরূপ। যে রোযা রাখে সে যেন অশ্লীল কথা-বার্তা ও গাল-মন্দ না করে। কেউ যদি তাকে গাল মন্দ দেয় অথবা ঝগড়া করে সে যেন বলে আমি রোযাদার। আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট কস্তুরীর গন্ধের চাইতে প্রিয়। রোযাদারের দু'টি আনন্দ যা তাকে আনন্দিত করে। প্রথমত হলো, যখন সে ইফতার করে তখন সে আনন্দ পায় আর দ্বিতীয় যখন সে তার প্রভুর সাথে

সাক্ষাত করবে তখন তার রোযার দ্বারা আনন্দিত হবে।

আল্লাহ্ তাআলা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ওপরে রোযা ফরয করে বলেছেন, এটা কোন অভিনব ইবাদত নয় বরং তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও এটা ফরয করা হয়েছিল। এই ইবাদতের সবচেয়ে বড় কল্যাণ হলো এই, নিষ্ঠার সাথে রোযা পালনকারী তাক্ওয়ার অধিকারী হয়। অর্থাৎ তাক্ওয়া অর্জনের জন্য আল্লাহ্ রোযাকে একটি উত্তম মাধ্যম বলে আখ্যা দিয়েছেন। হযরত রসূল করীম (সা.) হতে আমরা জানতে পেরেছি, এ পৃথিবীতে মানুষ যতগুলো আমল করে সবই তার নিজের জন্য কিন্তু রোযাই একমাত্র ইবাদত যা আল্লাহ্র জন্য এবং আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, আমি স্বয়ং রোযার প্রতিদান। রোযার অর্থ হলো আত্মসংযম। যে ব্যক্তি রোযা রাখা সত্ত্বেও অসন্তুষ্টির পথ পরিত্যাগ করে না এমন ব্যক্তির ক্ষুধার্ত থাকার কোন মূল্য নেই। রোযাদারের সকল আচরণ খোদার নির্দেশ অনুযায়ী হলে এর পরেই আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন হবে। সাধারণত দেখা যায়, রোযা তো রাখা হয় কিন্তু নামায থেকে গাফেল, ব্যবহার খারাপ এবং অন্যান্য অসৎ কাজও করা হয়। এমন রোযাকে আল্লাহ্ তাআলা রোযা বলে গণ্য করেন নি। প্রকৃত রোযা মানুষের জীবনের মাঝে এক পরিবর্তন আনয়ন করে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ৩১ অক্টোবর ২০০৩ জুমুয়ার খুতবায় রমযান সম্বন্ধে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রোযা সম্পর্কিত উদ্ধৃতি তুলে ধরেন ঃ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "রমযান সূর্যের তাপকে বলা হয়। রমযান মাসে মানুষ যেহেতু খানা-পিনা এবং আরো সব শারীরিক ভোগ উপভোগ থেকে নিজেকে বিরত রাখে ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহ্র সকল আদেশ নিষেধ পালনের জন্য দারুন উৎসাহিত থাকে , আধ্যাত্মিক ও শারীরিক এ দুই উষ্ণতা ও উত্তাপ মিলে রমযান হয়েছে। অভিধানবিদরা বলেছেন যে, গ্রষ্মীকালে রমযান আরম্ভ হয়েছিল বলে রমযান নাম হয়েছে আমার মতে এ কথা ঠিক না। কারণ আরবদের জন্য এটি কোন বিষয় না। আধ্যাত্মিক বা রূহানী রমযান অর্থ রূহানী (ধর্মীয়) কাজে আগ্রহ এবং উত্তাপ। অবশ্য ঐ গরমকেও রমযান বলা হয় যাতে পাথর গরম হয়" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, ৯০২ পৃষ্ঠা)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন, এখানে হযরত আকদাস (আ.) বলেছেন যে, রমযান সূর্যের তাপকে বলে। যারা গরম দেশে বাস করে তারা জানে যে, সূর্যের তাপ কি জিনিষ, কি অবস্থা হয়? আর যদি বাতাস বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কষ্ট অনেক বেড়ে যায়। গরমে শরীরে বিভিন্ন প্রকার দাগ দেখা দেয় (ঘামাচি ইত্যাদি)। যাদের কাছে গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে না অর্থাৎ কোন উপকরণ থাকে না তারা শরীরে বিভিন্ন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করে, অনেক সময় তা অসহনীয় হয়ে দাঁড়ায়। আজকাল অবশ্য ইউরোপীয় দেশগুলোতেও গরম খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। ছায়ার বাহিরে গেলে রোদের উত্তাপ কাহিল করে দেয়। আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা এই গরমের মধ্যেও খানা-পিনা এবং অন্যান্য শারীরিক আরামে জিনিষ পরিত্যাগ করে আমার জন্য কষ্ট কর। যখন তোমরা আমার উদ্দেশ্যে কষ্ট করবে তখন তোমাদের মধ্যে পুণ্য কর্মের জন্যও প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া উচিত। আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মান্য করার ইবাদত করার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি হওয়া উচিত। বলেছেন, শারীরিক ক্ষুধা ও পিপাসার জ্বালা এবং অভ্যন্তরে আল্লাহ্র ভালবাসার দাহন একত্রিত হয়ে নাম হয়েছে রমযান।

বলেছেন, রমযান মাসে কুরআন নাযেল হয়েছে অর্থাৎ কত মহিমান্বিত এ মাস! আওলিয়ায়ে কেরাম লিখেছেন, হৃদয়কে নূরান্বিত করার জন্য খুব উপযুক্ত মাস। অনেক বেশী ঐশী নূরের বিকাশ ঘটে থাকে এ মাসে। নামায আত্মার পরিশুদ্ধি করে আর রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে। আত্মার পরিশুদ্ধি অর্থ নফসে আম্মারার আক্রমণ থেকে দূরে থাকা বা এর থেকে দূরে থেকে অবস্থান করা । হৃদয় আলোকিত হওয়ার অর্থ কাশ্ফ বা ঐশী দর্শন বা দিব্য-দর্শনের দরজা উন্মুক্ত হওয়া এবং আল্লাহ্র সাক্ষ্য লাভ করা। বলা হয়েছে, "এ মাসে কুরআন নাযেল হয়েছে" এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রোযার পুরস্কার যে অনেক বড় পুরস্কার এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আনুগত্য অন্যান্য জটিলতা অনেক সময় মানুষকে এ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে দেয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন ঃ আমার স্মরণ আছে যৌবনে আমি একবার স্বপ্নে দেখেছি রোযা পালন আহলে বয়আতের সুন্নত। আমার পক্ষে আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, **'সালমানু মিন্না আহলাল বায়তে'** –সালমান অর্থাৎ সুলাহান অর্থ এর হাতে দু'টি আপোস হবে। একটি অভ্যন্তরীণ অপরটি বহির্জগতের এবং এ কাজ সে নিজ নম্রতার দ্বারা সম্পাদন করবে, তরবারির সাহায্যে না তারপর আমি হযরত হোসাইন (রা.)-এর সমমনা নই যিনি যুদ্ধ করেছেন। বরং আমি হযরত হাসান (রা.) এর সমমনা নই যিনি যুদ্ধ করেন নি।' এতে আমি মনে করছি যে, আমাকে রোযা রাখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতঃপর আমি ক্রমাগত ছয় মাস রোযা রেখেছি। সে যুগে আমি দেখেছি যে, আলোর বড় বড় স্তম্ভ আকাশের দিকে যাচ্ছে। তবে আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয় যে, আলোর ঐ স্তম্ভগুলো মাটি থেকে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছিল না আমার বুক থেকে। কিন্তু এমন সাধনা তো যৌবন বয়সেই সম্ভব হয়। সে সময় আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে চার বছর পর্যন্ত রোযা রাখতে পারতাম।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) রোযার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন ঃ "আমাদের দেহে দৈনিক যে রূহানী বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা একটি ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয়, তা দূর করার জন্যে আর একটি ব্যবস্থা করেছেন অর্থাৎ দৈনিক যে আধ্যাত্মিক বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য তিনি দৈনিক পাঁচবারের নামাযের ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয় তা দূর করার জন্যে রমযানে এক মাসের রোযা রাখার ব্যবস্থা করেছেন। রোযা না রাখার ফলে বছরব্যাপী পুঞ্জীভূত বিষ বাড়তেই থাকে এবং এর ফলে সেই ব্যক্তির মাঝে এরূপ কাঠিন্য সৃষ্টি হয় এবং এরূপ দৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি হয় যে, খোদা তাআলা তার সম্মুখে এলেও তাঁকে সে চিনতে পারে না। যেমন কোন ব্যক্তি দৃষ্টি-শক্তি হারালে তার অত্যন্ত নিকট্ - আত্মীয় সম্মুখে দাঁড়ালেও সে তাকে দেখতে পারে না। অনেকে মনে করে যে, তারা রোযা রেখে বড়ই ইহসান (উপকার) করছে। এরূপ করার মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই নেই। চিকিৎসক কোন রুগীর চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্তক্ষরণ করলে যদি সে রুগী মনে করে যে, সে রক্ত দিয়ে ডাক্তারের বড়ই উপকার করেছে তা হলে তার অপেক্ষা বড় মূর্খ আর কে আছে? ঔষধ যতই তিক্ত হোক তা রুগীর জন্য কল্যাণজনক। তদ্রুপ যখন কেউ রমযান মাসে রোযা রাখে, তখন সে খোদা তাআলার ওপর ইহসান করে না বরং এটা তার ওপর খোদা তাআলার ইহসান যে, তিনি এরূপ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং এ মাসের প্রতি সম্মান দেখানো আমাদের বিশেষ কর্তব্য। আমরা এ দিনগুলোকে যত বেশি সদ্ব্যবহার করবো, আমাদের অন্তরের পুঞ্জীভূত বিষ ততই দূর হয়ে যাবে, যেগুলো ভিতরে ভিতরে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছিল" (আল ফযল ১৯-১২-১৯৬৫)।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন, অতএব, রমযান মাসের সাথে দোয়া কবুলের গভীর সম্পর্ক। এ মাসে যারা দোয়া করবে তাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা (আমি তোমাদের খুব কাছে) কাছে বা নিকটে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যিনি নিকটে থেকেও পাওনা পাওয়া যায় না তাহলে আর কবে পাওয়া যাবে? যখন বান্দা তাঁকে খুব জোরালোভাবে ধরে বলে এবং কার্যক্রম দিয়ে প্রমাণ করে যে, এরপর সে আর কখনও আল্লাহর চৌকাঠ ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না, তখন আল্লাহ্র রহমতের দরজাগুলো সব খুলে দেয়া হয়। আমি তোমার খুব কাছে এ কণ্ঠস্বর যে শুনতে থাকে এবং এর একমাত্র অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাঁর সাথে আছেন। যখন কোন মানুষ এ অবস্থা লাভ করে বুঝে নিতে হবে যে, সে আল্লাহ্কে পেয়ে গেছে।" (পাক্ষিক আহমদী, ১৫ অক্টোবর ২০০৪)

**আমাদের দেহে দৈনিক যে রূহানী বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা একটি ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয়, তা দূর করার জন্যে আর একটি ব্যবস্থা করেছেন অর্থাৎ দৈনিক যে আধ্যাত্মিক বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য তিনি দৈনিক পাঁচবারের নামাযের ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয় তা দূর করার জন্যে রমযানে এক মাসের রোযা রাখার ব্যবস্থা করেছেন।**

হাদীসে হযরত ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়াত আছে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন ঃ "রমযান মাসে আল্লাহ্র যিকর যারা করে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়, এ মাসে আল্লাহ্র কাছে চেয়ে কেউ বঞ্চিত থাকে না।"

আঁ হযরত (সা.) এ কথাও বলেছেন যে, রোযাদার ব্যক্তি ইফতারী করার সময় যা দোয়া করে তা কখনই না মঞ্জুর হয় না। (ইবনে মাজাহ্)

খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রা.) বলেছেন ঃ

"যদি মানুষ জিজ্ঞেস করে যে, রোযার দ্বারা কিভাবে নৈকট্য লাভ হয়। তুমি বল, আমি খুব নিকটে এবং এ মাসে যারা দোয়া করে তাদের দোয়া শুনে থাকি। তাদের উচিত তারা যেন আগের থেকে আমার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে যা আমি আদেশ দিয়ে রেখেছি। আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যেন সে উদ্দেশ্যে লাভে সফল হতে পারে এবং এভাবে সে অনেক উন্নতি করবে।" (আল হাকাম ১৭ নভেম্বর ১৯০৭ইং পৃঃ ৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রা.) আরও বলেছেন ঃ "রোযা যেমন তাক্ওয়া লাভের মাধ্যম তেমনি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। তাইতো রমযানের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)-এ আয়াত রমযানের বরকত সম্পর্কে নাযেল হয়েছে। এখান থেকে রমযান মাসের সম্মান এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে জানা যায় যে, যদি কেউ এ মাসে দোয়া করে তাহলে আমি কবুল করব। কিন্তু তার উচিত হবে আমার কথা মেনে চলা এবং মান্য করা। মানুষ যত আল্লাহ্র আদেশ পালনে শক্তি ব্যয় করে আল্লাহ্ও তত বেশি তার দোয়া কবুল করেন। তারপর আয়াতের শেষে যে বলা হয়েছে, "যেন তারা হেদায়াত পায়" এর থেকে জানা যায় যে, হেদায়াত লাভ করাও এ মাসের বরকত। এ মাসে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান, তাঁর

(অবাশিষ্টাংশ ৩৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

# জ্ঞান-জিজ্ঞাসা

**এটি একটি সাধারণ প্রশ্নোত্তরমূলক আলোচনা। প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন-মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমিন (মুরব্বী সিলসিলাহ্)। আর বিষয়টি দেখে দিয়েছেন মোহতারাম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী (মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশে)।**

**প্রশ্ন ঃ মহানবী (সা.) সুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন কিন্তু আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, ইসলাম প্রচারের কাজে সুদের টাকা ব্যয় করে কেন?**

**ফারুক আহমদ, ঢাকা।**

**উত্তর ঃ** এটা নিঃসন্দেহে ঠিক, রসূল (সা.) সুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন। সুদকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দিতে চেয়েছেন। আমরাও এটাই চাই। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর অনুসারীদেরকে সুদের টাকা নিজে ব্যবহার না করে ইশায়াত ফান্ডে অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যয় করতে বলেছেন।

এর কারণ হলো– আজ সুদ ব্যবস্থা সারা জগতে ছেয়ে গেছে। এটাকে যদি নিঃশেষ করতে হয়, তাহলে সুদ বিহীন ইসলামী ব্যবস্থাকে প্রসারিত করতে হবে। এটা যখন প্রসার লাভ করবে, অর্থাৎ খাঁটি ইসলাম তথা আহমদীয়াত যখন সারা দুনিয়াতে জয় লাভ করবে তখন সুদ বিহীন লেনদেন ব্যবস্থা চালু হবে আর সুদ ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এজন্য সুদ ব্যবস্থাকে পৃথিবী থেকে চিরতরে মিটিয়ে দেয়ার জন্যই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সুদের টাকাকে ইসলাম প্রচার ফান্ডে প্রদান করার জন্য বলেছেন।

(বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন তফসীরে কবীর ১ম খন্ড, পৃঃ ৬৩১-৬৩৬)

সুদের টাকা কেন ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–

"আমাদের এটাই বিশ্বাস, আর আল্লাহ্ তাআলা আমাদের হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়েছেন যে, এমন টাকা ধর্মের প্রচারের কাজে খরচ করা যাবে। এটা একেবারে সত্য কথা সুদ হারাম। কিন্তু এটা ব্যক্তিগত ব্যয়ের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্ তাআলার করায়ত্বে যে জিনিস যায় সেটা হারাম থাকতে পারে না। কেননা হালাল-হারামের বিধান মানুষের জন্য, আল্লাহ্ তাআলার জন্য নয়। অতএব সুদ নিজের জন্য, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম। কিন্তু এটাকে যদি শুধু ধর্ম প্রচারের জন্য খরচ করা হয় তাহলে এতে কোন মানা নেই। বিশেষভাবে এমন অবস্থায় যখন ইসলাম খুবই দুর্বল হয়ে গেছে, এর সাথে লোকদের যাকাত না দেয়ার আপদও যোগ হয়েছে। আমি লক্ষ করেছি, এই মুহূর্তে দু'টি আপদ দেখা দিয়েছে আর দুটি হারাম জিনিস বৈধ করে নেয়া হয়েছে। প্রথম হলো–যাকাত। যার দেয়ার কথা সে দিচ্ছে না। দ্বিতীয় হলো– সুদ। যাদেরকে নিতে নিষেধ করা হচ্ছে তারা নিচ্ছে। অর্থাৎ যা খোদা তাআলার প্রাপ্য অধিকার তা দিচ্ছে না, আর যা নিজের প্রাপ্য অধিকার নয় তা নিচ্ছে। অবস্থা যখন এমন দাঁড়িয়েছে, আর ইসলাম চরম দৈন্যতার সম্মুখীন। তখন আমি এই ফতোয়া দিচ্ছি, এমন সুদের টাকা যা ব্যাংক থেকে পাওয়া যায়, তার পুরোটা ধর্ম প্রচারের কাজে খরচ করা উচিত। আমি যে ফতোয়া দিচ্ছি এটা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নতুবা সুদ নেয়া ও দেয়া দু'টিই হারাম। কিন্তু ইসলামের এ দৈন্যতার যুগে, যখন অর্থনৈতিক উন্নতির উপকরণ সৃষ্টি হয় নি আর মুসলমানরা এ বিষয়ে উদাসীন, তখন এমন টাকা ইসলামের কাজে ব্যবহার করা হারাম নয়।

কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গীতে যাকে হারাম বলা হয় তা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য হারাম। এটাও স্মরণ রাখবেন সুদ নিজের জন্য যেমন বৈধ নয়, তেমনি অন্য কাউকে দেয়া বৈধ নয়। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তাআলার করায়ত্বে এমন সম্পদ দিয়ে দেয়া বৈধ। আর এর একমাত্র পন্থা হলো এটা শুধু মাত্র ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যয় হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোথাও জিহাদ হচ্ছে, আর এর গোলাবারুদ একজন দুষ্কৃতকারীর নিকট থেকে নেয়া হচ্ছে। সে সময় গোলাবারুদ হারাম একথা ভেবে বিরত থাকা ঠিক নয়। বরং সঠিক পন্থা হলো, এগুলোকে যেন ব্যবহার করা হয়। এ সময় তরবারীর জিহাদ আর বাকি নেই। আর খোদা তাআলা তাঁর অনুগ্রহে আমাদেরকে এমন এক সরকার প্রদান করেছেন যারা সব ধরনের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছে। এখন কলমের জিহাদের যুগ। এজন্য ইশায়াতে ইসলামের কাজে আমরা এটাকে খরচ করতে পারি"। (মলফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৬৭-৩৬৯, নতুন সংস্করণ) এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে মলফুযাতের নতুন সংস্করণের ৪ খন্ডের ৩৭৩-৭৪, ৫ম খন্ডের ৪৩৬ পৃষ্ঠা, ৩য় খন্ডের ১৬৫-১৬৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

**প্রশ্ন ঃ সাধারণ অবস্থায় অনাত্মীয় নর-নারীর মধ্যে সামাজিক কিংবা পারিবারিকভাবে অনুমোদিত অথবা অননুমোদিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ কি না?**

**মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান, মিরপুর**

উত্তর ঃ কোন অবস্থাতেই ইসলাম নর-নারীর তথাকথিত অবাধ মেলামেশাকে বৈধতার দৃষ্টিতে দেখে না। সেটা সামাজিক বা পারিবারিকভাবে অনুমোদিত বা অননুমোদিত যা-ই হোক। বন্ধুত্ব বলতে যদি একান্তে কথা বলা, গল্প করা, নিভৃতে সময় কাটানো, নিজেদের একান্ত ব্যক্তিগত কথাগুলো পরস্পরকে শুনানো বা ঢলাঢলি করা বুঝায় তাহলে তা মোটেও বৈধ নয়। কেননা ইসলাম যেখানে অতি নিকটাত্মীয় ছাড়া বাকী আত্মীয় অনাত্মীয় যেই হোক তাদের সামনে দৃষ্টিকে অবনত রাখতে, সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ না করতে বলেছে। সেখানে এমন সম্পর্ক কিভাবে বৈধ হয়? (দেখুন সূরা নূর ঃ ৩২ নং আয়াত) এ প্রসঙ্গে রসূল করীম (সা.)-এর একটি হাদীস উপস্থাপন করছি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন–তোমাদের কেউ যেন কোন নারীর সাথে একান্ত নিভৃত্তে সাক্ষাত না করে, তবে তার সাথে তার কোন মাহরাম পুরুষ আত্মীয় থাকলে তা ভিন্ন কথা। (বুখারী, মুসলিম)

এ বিষয়ে আরও জানতে দেখুন-কিস্তিয়ে নূহ্ চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ঃ ৪২, ইসলামী নীতিদর্শন ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ঃ ৪৮-৪৯।

**প্রশ্ন ঃ মোবাইল ফোনের রিংটোন এবং ওয়েলকাম টোন হিসেবে কুরআনের আয়াতসমূহের ব্যবহার করা কুরআনের আদবের খেলাফ কিনা?**

**হাজারি আল মুনিম, মিরপুর।**

**উত্তর ঃ** পবিত্র কুরআন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য হলো মানবজাতিকে এর মাধ্যমে হেদায়াত দান করা, সত্য পথ-প্রদর্শন করা। সাথে সাথে কুরআনের মান্যকারীদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে–মনোযোগের সাথে কুরআন পাঠের, এর শিক্ষা গ্রহণের ও শিখানোর। আর যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন এর মান্যকারীদের জন্য করণীয় হলো–

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

অনুবাদ ঃ যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা তা কান পেতে শুন এবং নিরব থাক যেন তোমাদের প্রতি রহম করা হয়। (সূরা আ'রাফ ঃ ২০৫)

এ আয়াতে বিষয়টি অতি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যখনই কুরআন পাঠ করা হবে এর মান্যকারীকে অবশ্যই তা মনোযোগ দিয়ে, নিরবে শুনতে হবে। কিন্তু মোবাইলের রিংটোন বা ওয়েলকাম টোন হিসেবে কুরআনের আয়াত বাজলে এ নির্দেশ কোন ভাবেই বাস্তবায়ন হয় না। এছাড়াও মানুষ মোবাইল ফোন সাথে নিয়ে টয়েলেট প্রভৃতি জায়গায় যায়। সে সব জায়গায় রিংটোন বা ওয়েলকাম টোন হিসেবে কুরআন বাজুক সেটা কোনভাবেই শোভনীয় নয়। কুরআনের প্রতি যার নূন্যতম সম্মানবোধও রয়েছে সেও এটা হোক চাইবে না। তাই কুরআনকে তার উদ্দেশ্যে (মানুষকে হেদায়াত দেয়ার পথ প্রদর্শন করা) ও তার নির্দেশনার বিরোধী কোন কাজে ব্যবহার করা এটা আমাদের দৃষ্টিতে কুরআনের আদবের খেলাফই হবে।

**প্রশ্ন ঃ (ক) পোষ্ট অফিসে টাকা ৩-৫ বছর মেয়াদে জমা রেখে যে অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করা হয় তা কি সুদ না মুনাফা ?**

**(খ) কসর কোন অবস্থায় কিভাবে আদায় করতে হয়?**

**(গ) কাজা নামায আদায়ের উত্তম পদ্ধতি কি?**

**এম ওয়াহিদুজ্জামান, রাজবাড়ী।**

**উত্তর ঃ (ক)** এর উত্তর দেয়ার পূর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রদত্ত সুদের সংজ্ঞা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–

" শরীয়তে সুদের সংজ্ঞা হচ্ছে–কোন এক ব্যক্তি নিজের লাভের জন্য কাউকে টাকা ঋণ দেয়, আর তাতে লাভ নির্ধারণ করে দেয়। এ শর্তগুলো যেখানেই পূর্ণ হবে সেটাকেই সুদ বলা হবে। কিন্তু যে টাকা নিয়েছে যদি সে কোন প্রতিশ্রুতি না দেয়, বরং নিজের পক্ষ থেকে কিছুটা বাড়িয়ে ফেরৎ দেয়। আর সে এটা সুদ হিসেবে না দেয়, তাহলে এটাও সুদের মাঝে গণ্য হবে না। এটা বাদশার পক্ষ থেকে ইহসান (অনুগ্রহ) স্বরূপ হবে। আল্লাহ্র রসূল (সা.) যখনই কোন ঋণ নিতেন, তা ফেরৎ দেবার সময় অবশ্যই কিছুটা বাড়িয়ে ফেরৎ দিতেন। তবে এটা দৃষ্টিতে রাখতে হবে–নিজের লোভ-লালসা যেন এতে মিশ্রিত না থাকে। লোভ-লালসা ছাড়া যেটা বাড়তি পাওয়া যাবে সেটা সুদ নয়।"

(মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৭ নতুন সংস্করণ), একই পৃষ্ঠার অন্য জায়গায় হুযূর (আ.) বলেন,

"সরকার থেকে যে টাকা পাওয়া যায়। তা তখন সুদ হবে, যখন কেউ সুদ পাবার আকাঙ্ক্ষায় টাকা রাখবে। নতুবা সরকার নিজ পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ যা দিবে তা সুদ হবে না।(ঐ পৃষ্ঠা ১৬৭)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপরোক্ত লেখা থেকে বুঝা যায়, ব্যক্তি, সরকার, পোষ্ট অফিস সবার ক্ষেত্রে যদি কেউ সেখানে লাভ নির্ধারণ করে টাকা রাখে অথবা লাভ পাবার আশায় টাকা রাখে তাহলে সেটা সুদের মধ্যে গণ্য হবে। তবে সরকার যদি বলে বা ঘোষণা দেয়–আমরা সুদ দিচ্ছি না। আমরা জনগণকে আমাদের পক্ষ থেকে পুরস্কারস্বরূপ দিচ্ছি। তাহলে সেটা রাজা-বাদশাহ্র অনুগ্রহ হিসেবে গণ্য হবে এবং সরকার যদি সঞ্চয়কারীকে পুরস্কার হিসেবে কিছু দেয় তাহলে তা তোহফা হবে।

যেমন প্রাইবন্ড স্কীম-জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কারস্বরূপ ঘোষিত একটি প্রজেক্টের নাম। যেখানে টাকা ঋণ প্রদানের বিষয় জড়িত নেই। যে কোন সময় টাকা ভাঙ্গিয়ে নেয়া যায়। এতে লাভের হারও নির্ধারিত নেই, সময় সীমাও নির্ধারিত নেই। কিন্তু অন্যান্য ব্যাংকের সঞ্চয়ের ব্যাপারে এ বিষয়টি প্রযোজ্য নয়।

তবে যেক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রদত্ত সুদের সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। এমন ব্যাংকিং ব্যবস্থা যদি কারও জানা থাকে তাহলে সেটার বিষয়ে নথিপত্রসহ কেন্দ্রে লিখে ফতোয়া আনা যেতে পারে।

**(খ)** যে প্রকৃত সফরে থাকবে সে কসর নামায পড়বে। কসর নামাযের নিয়ম হলো মুসাফির চার রাকাত ফরয নামাযের ক্ষেত্রে ২ রাকাত নামায পড়বে। তবে ফজরের দু'রাকাত সুন্নত ও বেতের নামায অবশ্যই পড়বে। অন্যান্য সুন্নত পড়তে হবে না।

মুসাফিরের জন্য কসর নামায পড়ার বিধান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "একটা হলো সফর অপরটি হলো পদ 'ভ্রমণ' । সফরের উদ্দেশ্যে যদি তিন ক্রোশও অতিক্রম করা হয়, তাহলে নামায কসর পড়া উচিত।"...... হাঁটার জন্য আট ক্রোশ গেলেও এটা সফর বলে গণ্য নয়, নামায কসর হবে না। (তাজকেরায়ে মাহদী ১৬৪ পৃঃ)

তিনি আরও বলেন, "নিজের নিয়্যতকে যাচাই করে নাও। এমন বিষয়ে তাক্ওয়ার (খোদাভীতি) আলোকে কাজ করা উচিত। কেউ যদি প্রতিদিন সাধারণ ব্যবসা বা সফরে থাকে তাহলে এটা তার সফর নয়। বরং সফর হলো বিশেষভাবে নিয়্যত করে যা করা হয়।" (ফতোয়ায়ে আহমদীয়া, ২০৫)

অর্থাৎ যারা সর্বদা সফরে থাকে বা যার সফরে থাকাটাই চাকুরী বা ব্যবসাগত দায়িত্ব তার জন্য এটা সফর গণ্য হবে না।

**(গ)** কেউ যদি ভুলে গিয়ে বা ঘুমিয়ে থাকার কারণে সঠিক সময়ে নামায পড়তে না পারে, কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পরে এ নামায পড়ে নেয় তাহলে এটাকে কাযা নামায বলে। কাযা নামায আদায়ের পদ্ধতি হলো, যখন স্মরণ হবে তখনই পড়ে নিতে হবে। আর বেশি বেশি তওবা ও ইস্তেগফার পড়বে।

আমাদের কাছে প্রশ্ন পাঠাবার ঠিকানা ঃ

সম্পাদক
পাক্ষিক আহমদী
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

বাংলাদেশ

ই-মেইল- pakkhik_ahmadi@yahoo.com

# নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের **কেন্দ্রীয় দপ্তরের জন্য নিয়মিত বেতন স্কেলে দু'জন অফিস সহকারী নিয়োগ দেয়া** হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের থেকে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

<u>যোগ্যতাঃ-</u>

*প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম H.S.C. পাশ।*
*প্রার্থীকে Computer কম্পোজ জানা থাকতে হবে এবং ন্যূনতম টাইপিং স্পিড 30 word per Minute হতে হবে (টাইপিং স্পিড 30word per Minute এর বেশি হলে S.S.C. পাশ হলেও আবেদন গ্রহণযোগ্য)।*
*প্রার্থীকে M.S. Word/Excel জানা থাকতে হবে।*
*প্রার্থীকে Windows 98/2000/XP এর ব্যবহার জানা থাকতে হবে।*
*প্রার্থীকে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেব কর্তৃক চারিত্রিক সনদপত্র প্রাপ্ত হতে হবে।*
*প্রার্থীর বয়স ২৫ বছরের কম হতে হবে।*

<u>আবেদন পত্রের সাথে প্রদত্ত কাগজপত্র ঃ-</u>

*প্রার্থীর সম্পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত দিতে হবে ।*
*প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি দিতে হবে।*
*স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র দিতে হবে।*
*শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের ফটোকপি দিতে হবে।*

প্রার্থীকে আগামী ৩০/০৯/২০০৮ইং তারিখের মধ্যে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের সুপারিশ সহকারে ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের বরাবরে আবেদন করতে হবে।

**মোহাম্মদ আবদুল জলিল**
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ

# তবলীগী দিক নির্দেশনা সংক্রান্ত জরুরী সার্কুলার

**ওয়ামান আহসানু ক্বাউলাম মিম্মান দায়া ইলাল্লাহি ওয়া' আমিলা সালিহান ওয়া ক্বালা ইন্নানি মিনাল মুসলেমিন।** অর্থাৎ এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে অধিক উত্তম যে লোকদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করে এবং সৎকর্ম করে এবং বলে নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পনকারীগণের অন্তর্গত? পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত ঘোষণায় আল্লাহ তা'লা তবলীগকারী ও তার কথাকে উত্তম আখ্যা দিয়েছেন। তাই তবলীগের গুরুত্ব সম্পর্কে তার অধিক কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যেক মু'মিন মুসলমান বিশেষ করে প্রত্যেক আহমদীর জীবন তবলীগের সাথে ওতপ্রতভাবে জড়িত। মাছ যেমন পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না তেমনি একজন প্রকৃত আহমদী তবলীগ না করে থাকতে পারে না। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাধারণ নিয়মে প্রত্যেক আহমদী প্রতি বছর কমপক্ষে একজনকে তবলীগ করে বয়আত করাবে।

অনেকের ধারণা মুরব্বী/মোয়াল্লেম ছাড়া তবলীগের কাজ হবে কেমনে? চলুন একটু ফিরে তাকাই- বাংলাদেশে বর্তমানে যতগুলো জামাত প্রতিষ্ঠিত তার গোড়ায় দেখুন কোন একজন ব্যক্তির দোয়া ও কুরবানি ও ব্যাকুলতা কাজ করেছে। তারা ছিলেন নিতান্তই সাধারণ মানুষ। কোন মুরব্বী-মোয়াল্লেম ছিলেন না, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী বা সম্পদশালীও না। উদাহরণস্বরূপ ফকির ইয়াকুব আলী সাহেবের নাম উল্লেখ করা যায়। অনেকে বলবেন তাদের দাদা/নানারাও আছেন তাদের মত-তা ঠিক কিন্তু সার্কুলারে সকলের অবদানের কথা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ আমরা যেন বাপ-দাদার উত্তম অবদানের গর্ব করেই খান্ত না হই বরং নিজেদের আমল দ্বারা তাদের অবদানকে চির জাগ্রত করি এবং তবলীগের মাধ্যমে বিস্তৃতি বা প্রসারতা দান করি। অভিজ্ঞতায় বলে অতীতে তবলীগ করতে গেলে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনকাল সংক্রান্ত কুরআন ও হাদীসের লক্ষণাবলীসমূহ বই খুলে দেখাতে হতো আর আজ পৃথিবীটাই যেন একটা খোলা বইয়ের পাতা, জনতাকে একটু ইশারা করলেই তারা বুঝতে পারে জগতের অবস্থা এমন কেন হচ্ছে আর এসব কিসের আলামত। মানুষের মনও অনেকটা উন্মুক্ত। তাই তবলীগের কাজে অল্প প্রচেষ্টাই বড় বড় সাফল্য বয়ে আনতে পারে। তবলীগ আল্লাহ তা'লার আদেশ এবং সকল নবী-রাসূলদের সুন্নত। আল্লাহর, অগনিত ফিরিশতা তবলীগের সহায়তায় নিয়োজিত। কাজেই জামাতের সকল স্তরের সদস্য-সদস্যাকে উদ্বুদ্ধ করে তবলীগের কাজে নিয়োজিত করুন। দেখবেন আল্লাহ তা'লা অচীরেই আপনার জামাতের অবস্থাকে কত উত্তম অবস্থায় বদলিয়ে দেন।

**নিম্নে তবলীগী কার্যক্রমের রূপরেখা দেয়া হ'লঃ**

১। প্রত্যেক জামাতে আমীর/প্রেসিডেন্ট অথবা তার বিশেষ কোন প্রতিনিধিকে আহবায়ক এবং সেক্রেটারী তবলীগকে সদস্য সচিব করে স্থানীয় জামাতের তবলীগ কমিটি তৈরী করুন। এর সদস্য হবেন যয়ীমে আলা/যয়ীম আনসারুল্লাহ, কায়েদ খোদ্দামুল আহমদীয়া, প্রেসিডেন্ট-লাজনা ইমাইল্লাহ ও হালকা থাকলে হালকার প্রেসিডেন্টগণ। জামাতে মুরব্বী/মোয়াল্লেম থাকলে তিনি হবেন উপদেষ্টা। উক্ত কমিটির আহবায়ক ও সদস্য সচিবের (ফোন নম্বরসহ) তালিকার একটি কপি কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিন।

**২। তবলীগী কর্ম পদ্ধতিঃ**

ক) উপরোক্ত কমিটির সাথে জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা (জামাতী ও সকল অঙ্গ সংগঠনের) পূর্ণ সহযোগিতা দান করবে। যেমনটি হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ) তাঁর এক খুতবায় বলেছিলেন তবলীগের কাজে শুধু তবলীগ সেক্রেটারীই নয় বরং আমীর/প্রেসিডেন্টসহ সকল কর্মকর্তাকেই তবলীগ সেক্রেটারীর ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন তবলীগের কাজে কাউকে পৃথক হতে দেব না অর্থাৎ জামাত ও অঙ্গ সংগঠনগুলি এলোমেলো বা বিক্ষিপ্ত তবলীগী কার্যক্রম প্রণয়ন করবে না বরং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে উপরোক্ত তবলীগ কমিটিতে সকল অঙ্গ সংগঠনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

খ) তবলীগ কমিটি গঠন পুর্বক অনতিবিলম্বে কমিটির সভা করে প্রথম সভায় (১) জামাতের সকল স্তরের সদস্য-সদস্যাকে তবলীগের কাজে উদ্বুদ্ধ করণ, সকলকে প্রাথমিকভাবে অ-আহমদী আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তাদের সাথে তবলীগ করা। (২) বিশেষ তবলীগী ক্ষেত্র চিহ্নিত করে জামাতের মধ্যে উৎসাহী দাঈ-ইলাল্লাহর তালিকা তৈরী করে তাদেরকে নিয়ে স্থানীয় তবলীগ কমিটি প্রয়োজন অনুসারে কয়েকটি ছোট আকারের তবলীগী টীম বানিয়ে চিহ্নিত তবলীগী পকেট বা ক্ষেত্রে তবলীগের কাজে নিয়োজিত করবেন।

গ) প্রত্যেক সদস্য এবং ছোট ছোট টীমগুলির নিয়মিত তবলীগের ফলাফল অর্থাৎ জেরে তবলীগের তালিকা সংগ্রহ করে প্রতি মাসের ৩য়/৪র্থ সপ্তাহের কোন এক দিনে তবলীগী সভা ও প্রশ্নোত্তর আলোচনার আয়োজন করবেন যাতে শুধু জেরে তবলীগ ও তবলীগকারীগণ বিশেষভাবে উপস্থিত থাকবেন। এদের তালিকা/হাজিরার কপি ও তবলীগী রিপোর্ট বিলের সাথে কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় জামাতের সদস্যদেরকে নিয়মিত তবলীগে নিয়োগ না করে হঠাৎ তবলীগী

সভা ডাকা হয় যাতে উপস্থিতির সংখ্যা থাকে উল্লেখযোগ্য– যেমন আনসার, খোদ্দাম ও লাজনাসহ উপস্থিতির সংখ্যা ৭৫ জন ও জেরে তবলীগ ৫ জন। আর আপ্যায়ন করানো হয় ৮০ জনকে। কেন্দ্র ৫ জন জেরে তবলীগও তাদেরকে যে ৫ জন দাঈ ইলাল্লাহ উপস্থিত করিয়েছেন তাদের মোট ১০ জনের আপ্যায়নের খরচ বহন করবে। বাকী শুধু দর্শক আহমদীদেরকে হয় জেরে তবলীগ উপস্থিত করাতে হবে অথবা আপ্যায়ন খরচ নিজে বহন করতে হবে।

ঘ) বিশেষ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশার লোক থাকলে তাদেরকে তবলীগের টার্গেট করে সংশ্লিষ্ট পেশার সদস্যদের টীম বানিয়ে তাদেরকে তবলীগে লাগাতে হবে।

ঙ) ছাত্র/ছাত্রী, আতফাল ও নাসেরাতকে তবলীগী লিফলেট ও হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী ও ইমাম মাহদীর আবির্ভাব পুস্তিকা বিতরণে নিয়োজিত করুন।

চ) নিয়মিত তবলীগ জোরদার করলে দেখা যাবে কোন জামাতে বড় আকারের তবলীগী সমাবেশ করার প্রয়োজনীয়তা হতে পারে সেক্ষেত্রে বিস্তারিত বিবরণসহ মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে পূর্বানুমতির জন্য লিখতে হবে যাতে তিনি অনুমতি, বরাদ্ধ ও প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারেন।

**২। আঞ্চলিক আহবায়ক /সমন্বয়কারীদের ভূমিকাঃ**

ক) স্থানীয় জামাতের গৃহীত কার্যক্রম ও তার বাস্তবায়ন মনিটর করে প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা দিবেন। যেমন-

খ) কোন জামাতে তবলীগী ক্ষেত্র প্রসারিত হলে আর ঐ জামাতে যদি লোকবল স্বল্প থাকে অথচ কাজের সুফল লক্ষ্যনীয় তবে অঞ্চলের অধীনস্থ অন্য জামাত থেকে তিনি দাঈ-ইলাল্লাহ ও উপযোক্ত ও আগ্রহী সদস্যকে সংগ্রহ করে তবলীগের বিভি-ন্ন প্রোগ্রামে সমন্বিত করবেন।

গ) উর্বর তবলীগী ক্ষেত্রে যখন পূর্ননির্ধারিত কোন তবলীগী অনুষ্ঠান হবে তখন আঞ্চলিক তবলীগী আহবায়ক সেই অনুষ্ঠানে নিজে অংশ গ্রহণ করবেন। একান্ত অপারগতায় কেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে তিনি সাময়িকভাবে স্থানীয় কোন মোয়াল্লেম সাহেবকে সেখানে পাঠাতে পারবেন।

ঙ) যে কোন জামাত তবলীগের কাজকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজনে আঞ্চলিক আহবায়ক/সমন্বয়কারীর সাহায্য/সহযোগিতা নিবেন তদুপরি বিশেষ প্রয়োজনে কেন্দ্রে লিখবে যাতে সঠিক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা যায়।

তবলীগী কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে জামাতের মুরব্বী/মোয়াল্লেম, সকল কর্মকর্তা, আনসার, খোদ্দাম ও লাজনাকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আনসার, খোদ্দাম ও লাজনার টার্গেট পূরণের ক্ষেত্রে বয়াত ফরমে-কাহার তবলীগে বয়াত হল, সে নামের পাশে (        ) ব্র্যাকেটে খোদ্দাম/আনসার/লাজনা লিখলে তা তাদের কোটায় লিপিবদ্ধ করা হবে।

আল্লাহ তা'লা সকলকে তবলীগের কাজে পূর্ণ অংশগ্রহণের তৌফীক দিন, আমীন।

**মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন**
ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ

---

(২৮ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

নির্দেশাবলীর আনুগত্য এবং দোয়ার মাধ্যমে হেদায়াত লাভ হয়। আরো কথা রয়েছে। যদ্দারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়। (আল হাকাম, ২৪ জানুয়ারী ১৯০৪ইং পৃঃ ১২)

হযরত আকদাস মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) বলেছেন ঃ

রমযান মাস বড় কল্যাণমন্ডিত মাস, দোয়ার মাস।" (আল হাকাম, ২৪ জানুয়ারী, ১৯০১ইং)

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন ঃ রমযান মাসের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ্‌ তাআলা একজন আহ্বানকারী ফেরেশ্‌তাকে পাঠান, যিনি এসে ঘোষণা দেন, হে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী! সামনে এগিয়ে চল! সামনে এগিয়ে চল! কেউ এমন আছে না কি যে দোয়া করে তার দোয়া যেন কবুল করা হয়? কেউ কি ক্ষমা প্রার্থনা করছে যে, তাকে যেন ক্ষমা করা হয়? কেউ কি তওবা করছে যে, তার তওবা যেন কবুল করা হয়?" (কনযুল উম্মাল)

হে আল্লাহ্‌ তাআলা! আমাদেরকে এই পবিত্র রমযানে তোমার প্রিয়জনদের মত করে দোয়া করার শক্তি দাও। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর উম্মতের জন্য, তাঁর প্রিয় মাহদী (আ.)-এর অনুসারীদের জন্য যে সমস্ত দোয়া করে গেছেন আমাদেরকে এর ওয়ারীশ (উত্তরাধিকারী) বানাও।

আল্লাহ্‌ তুমি আমাদেরকে তোমার প্রিয় বান্দা বানাও। আমরা যেন তোমার সামনে ঝুঁকে থাকি। আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি দয়া কর। হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে এ রমযানের সীমাহীন কল্যাণ প্রদান কর। প্রত্যেক অনিষ্ট, মন্দ থেকে বাঁচাও। তোমার রহমতের ও ফযলের আবরনের মধ্যে চিরদিন আবৃত করে রাখ। আর এই রমযানের প্রতিটি মুহূর্ত যেন কাটে কেবল তোমারই স্মরণে। (আমীন)

# জামাআত ও অংগসংগঠন সমূহের কর্মতৎপরতার সংবাদ

ডেস্ক নিউজ ঃ হোসনে মোবারক

## ৭ম বিভাগীয় ওয়াকফে নও ক্লাস

৬ আগষ্ট ২০০৮, চট্টগ্রাম।

গত ১৯-০৬-২০০৮ইং রোজ বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার মসজিদে বাসেত চট্টগ্রাম এ তিন দিন ব্যাপী বিভাগীয় ওয়াকফে নও ক্লাস ২০০৮ ইং চট্টগ্রাম বিভাগ-২ অঞ্চলের উদ্বোধন করা হয়, উক্ত অনুষ্ঠানে ২৭ জন ওয়াকফে নও এবং তাদের পিতামাতাগণ অংশগ্রহণ করেন। ১৯-৬-২০০৮ইং রোজ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব ৭ম বিভাগীয় ওয়াকফে নও ক্লাস ২০০৮ ইং শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দিন খাদেম (নায়েবে আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাআত চট্টগ্রাম)। উক্ত অনুষ্ঠান কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াতের পর নযম পাঠ করেন, এরপর দোয়া পরিচালনা করেন, সভাপতি সাহেব। দোয়ার পর বক্তৃতা শুরু হয়। প্রথমে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জনাব আরিফুজ্জামান সেক্রেটারী ওয়াকফে নও চট্টগ্রাম। এরপর নছিহত মূলক বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুল মতিন (মুরব্বী সিলসিলাহ্)। এরপর সভাপতি সাহেব ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠান শেষে ওয়াকফে নও ক্লাস ২০০৮ইং উদ্বোধন করা হয়। উক্ত ক্লাস রাত ৯টা পর্যন্ত চলে। রাত ৩.৪৫ মিঃ তাহাজ্জুদের মাধ্যমে ২য় দিনের অর্থাৎ ২০/০৬/২০০৮ ইং তারিখ রোজ শুক্রবারের কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন ক্লাস, হাদীস শিক্ষার ক্লাস, নামায শিক্ষার ক্লাস, ধর্মীয় পুস্তক আলোচনার ক্লাস, বক্তৃতা শিক্ষার ক্লাস, আযান, আকামত ও আযানের দোয়া, উর্দু শিক্ষার ক্লাস, বাংলায় হুযূর (আই)-এর নিকট চিঠি লিখার নিয়মাবলী ইত্যাদি আলোচনা করা হয়। উক্ত ক্লাস পরিচালনা করেন (১) জনাব মাওলানা আব্দুল মতিন (মুরব্বী সিলসিলাহ্), (২) মাওলানা মনিরুজ্জামান, স্থানীয় মোয়াল্লেম, (৩) জনাব আনোয়ার আহমদ, দেহাতি মোয়াল্লেম, (৪) জনাব মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান, (৫) জনাব আকবর আহমদ। বিকেলে মেয়েদের জন্য পয়গামে রেসানী প্রতিযোগিতা, ছেলেদের জন্য খেলাধূলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় এমটি এর মাধ্যমে হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা দেখানো হয়। মাগরিবের নামাযের পর কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৩য় দিন অর্থাৎ ২১/০৬/২০০৮ইং রোজ শনিবার গ্রুপ ভিত্তিক কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, দ্বীনি মালুমাত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৫ টায় আছর নামাযের পর সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতারাম আমীর সাহেব (আহমদীয়া মুসলিম জামাআত চট্টগ্রাম)। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করে শুনান প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকারীগণ এরপর বক্তৃতা শুরু হয়, প্রথমে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব আরিফুজ্জামান (সেক্রেটারী ওয়াকফে নও চট্টগ্রাম বিভাগ), এরপর যথাক্রমে জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার (বিভাগীয় ওয়াকফে নও চট্টগ্রাম বিভাগ) এবং জনাব মোহতারাম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও বক্তব্য রাখেন। সর্বশেষ সভাপতি সাহেব সবাইকে ধন্যবাদ, জানিয়ে ভাষণ প্রদান করেন। এরপর উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ।

৭ম বিভাগীয় ওয়াকফে নও ক্লাসের ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে নসিহত মূলক বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম জামাআতের আমীর সাহেব

**আকবর আহমদ**

বিভাগীয় সেক্রটারী ওয়াকফে নও
আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, চট্টগ্রাম।

## ৫ম ওয়াকফে নও সম্মেলন ও তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

২৫ আগষ্ট ২০০৮, দারুত তবলীগ।

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযলে ঢাকা বিভাগীয় ৫ম ওয়াকফে নও-২০০৮ সম্মেলন ও তালিম তরবিয়তী ক্লাস গত ২৪ থেকে ২৮ জুন ২০০৮ বকশীবাজারস্থ দারুত তবলীগ মসজিদে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সম্মেলন ২৪ জুন রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব ন্যাশনাল আমীর মোহতারাম মোবাশ্শের উর রহমান সাহেব শুভ উদ্বোধন করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল ওয়াকফে নও সেক্রেটারী মোহতারাম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেব। ন্যাশনাল আমীর সাহেব তার উদ্বোধনী বক্তৃতায় ক্লাসে অংশগ্রহণকারী সকলকে মনোযোগ, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানান এবং ওয়াকফে নও পিতামাতাদের ক্লাসে ওয়াকফে নওদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ জানান।

ক্লাস যথারীতি ২৫ তারিখ বাদ ফজর থেকে শুরু হয়। ক্লাসে যেসব বিষয় শিক্ষা দেয়া হয় তাহলো, কুরআন, হাদীস, নযম, অর্থসহ নামায, তবলিগী মসলা মাসায়েল এবং ইসলাম তথা আহমদীয়াতের শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন মাওলানা সোলায়মান সুমন, মৌঃ হাফেয আবুল খায়ের, মৌঃ ক্বারী মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, মৌঃ মাহমুদ আহমদ সুমন। তাছাড়া প্রতিদিন বাদ মাগরিব নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় আমেলার সদস্যগণ এবং মুরব্বী সিলসিলাহ্গণ।

২৮ জুন মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনী অধিবেশন শুরু হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন প্রথম স্থান অধিকারী আমাতুস সাফী, নযম পাঠ করেন প্রথম স্থান অধিকারী শবনম মাসুদ। সভাপতি সাহেবের মূল্যবান নসিহতমূলক বক্তব্যের পর বিভিন্ন বিষয়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী ওয়াকফে নওদের পুরস্কার দেন এবং যারা পুরস্কার পায় নাই তাদের হাতেও পুরস্কার তুলে দেন। পরিশেষে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। এই সম্মেলনে ৪৬ জন ওয়াকফে নও অংশগ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ গোলাম কাদের
চেয়ারম্যান
ঢাকা বিভাগীয় ৫ম ওয়াকফে নও সম্মেলন ও তালিম তরবীয়তি ক্লাস উদযাপন কমিটি।

## মসজিদুল হুদায় 'মাসরুর কুরআন শিক্ষার অসর' উদ্বোধন

১৯ আগষ্ট ২০০৮, ঢাকা।

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ঢাকার আমীর মোহতারম জনাব আফজাল আহমদ খাদেম গত ০১/০৮/২০০৮ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মাদারটেক হালকাস্থ 'মসজিদুল হুদা'য় আনুষ্ঠানিক ভাবে উক্ত হালকার আতফাল ও নাসেরাতদের কুরআন এবং দ্বীনি মালুমাত শিক্ষার নিয়মিত ক্লাস উদ্বোধন করেন। এই ক্লাসের নাম দেয়া হয়েছে 'মাসরুর কুরআন শিক্ষার আসর'। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হালকার ২৪ জন আতফাল নাসেরাতসহ প্রায় সকল অভিভাবক (পিতা-মাতা) উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে ক্লাসের সংগঠক জনাব মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দীন রাহাত ক্লাসের সময়, পাঠ্যসূচী পরীক্ষা পদ্ধতি সর্বোপরি এই ক্লাসকে উৎসাহ ব্যঞ্জক করার জন্য গৃহীত পরিকল্পনা তুলে ধরেন। সকল অভিভাবককে যথা সময়ে বাচ্চাদেরকে ক্লাসে পাঠিয়ে তাদের দ্বীনি শিক্ষার এ সুযোগ গ্রহণ করতে উৎসাহমূলক বক্তব্য রাখেন ক্লাসের তত্ত্বধায়ক জনাব মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ। মোহতারম আমীর সাহেব আনন্দময় পরিবেশে পবিত্র কুরআন ও ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে এলাকার সকল আহমদী শিশু কিশোরদেরকে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের আদর্শ সেবক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উক্ত ক্লাস হতে উপকৃত হওয়ার জন্য সকল আতফাল নাসেরাতসহ অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ক্লাসটি দু'শিফটে পারিচালিত হচ্ছে। স্কুলের পড়া লেখার সাথে সমন্বয় রেখে ফজরের নামাযের পর ও আসরের নামাযের পর এক ঘন্টার এই ক্লাস নিয়মিত চলতে থাকবে (ইনশাআল্লাহ)। ক্লাসের শিক্ষক হেসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মিনহাজ উদ্দীন আহমদ রাহাত, জনাব আমানুর রহমান রাফাত এবং মোয়াল্লেম জনাব কাজল।

**বশীর উদ্দীন আহমদ**
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, ঢাকা।

### বার্ষিক ইজতেমা-২০০৮

৪ অক্টোবর ২০০৮, ধানীখোলা।

গত ১লা ও ২রা আগষ্ট ২০০৮ রোজ শুক্র ও শনিবার ২ দিন ব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ধানীখোলায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় (আলহামদুলিল্লাহ্)। মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ঢাকা রিজিওনের রিজিওনাল নাযেম জনাব মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরীর সভাপতিত্বে ১লা আগষ্ট ২০০৮ তারিখ বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইজতেমার

কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব হাফেয মনসুর আহমদ, আহাদ পাঠ করান কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি কায়েদ তাজনীদ জনাব মোহাম্মদ সারয়োর মোরশেদ। দোয়া পরিচালনা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি রিজিওনাল নাযেম জনাব মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব এ্যাডভোকেট মঞ্জুর আনাম। অতঃপর মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের কায়েদ জনাব তাজনীদ জনাব মোহাম্মদ সারোয়ার মোরশেদ, জেলা নাযেম জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাই, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ধানীখোলার যয়ীম জনাব ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব আব্দুল হক, সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা, ইজতেমার গুরুত্ব, আনসারুল্লাহ্র দায়িত্ব কর্তব্য, খিলাফত শতবার্ষিকী স্মারক মসজিদ নির্মাণ, ওসীয়্যতের গুরুত্ব, নওমোবাইনদের তালিম-তরবীয়ত এবং হুযূর আকদাস (আই.) এর কোলকাতা আগমন উপলক্ষে আনসারুল্লাহ্ সদস্যগণের সাক্ষাত লাভের উদ্দেশ্যে পাসপোর্ট তৈরীর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। দুই দিন ব্যাপী বার্ষিক জেলা ইজতেমায় তেলাওয়াতে কুরআন, নযম, দ্বীনি মালুমাত–লিখিত পরীক্ষা, বক্তৃতা পয়গামে রেসানী, স্মৃতি শক্তি পরীক্ষা, প্রশ্নোত্তর কুইজ প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন খেলাধূলা নিয়ে মোট ১১টি ইভেন্ট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে, জেলা নাযেম জনাব আব্দুল হাই, মজলিসে আনাসারুল্লাহ্ ধানীখোলার যায়ীম আলা জনাব ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান, মোয়াল্লেম জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হক ও মোয়াল্লেম জনাব বেলাল উদ্দীন দায়িত্ব পালন করেন।

ইজতেমা অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন ২রা আগষ্ট ২০০৮ তারিখ বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। তাহাজ্জুদ নামাযে উপস্থিত ছিল ২৯ জন। ফযর নামাযের পর কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা শেষে ১১-৩০ মিঃ রিজিওনাল নাযেম জনাব মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইজতেমার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব আব্দুল হক, যয়ীম জনাব ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান ও আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ধানীখোলার প্রেসিডেন্ট এ্যাডভোকেট মঞ্জুর আনাম ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি কায়েদ তাজনীদ জনাব মোহাম্মদ সারোয়ার মোরশেদ। অতঃপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করে দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ইজতেমায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার চারটি মজলিসের ৩ জন জেরে তবলীগসহ সর্বমোট ৩৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

**মোহাম্মদ সারোয়ার মোরশেদ**
কায়েদ তাজনীদ
মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ।

## তবলীগি সেমিনার

২৫ জুলাই ২০০৮, চট্টগ্রাম।

গত ২৫-৫-০০৮ইং বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্র উদ্যোগে এক তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে জেরে তবলীগ মেহমান বোনদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। উক্ত তবলীগি সেমিনারে স্থানীয় আমীর সাহেব প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রশ্নের উত্তরের মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন ও বিভিন্ন লক্ষণীয় দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেমিনারে ৫৮ জন লাজনা, নাসেরাত ও জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্ট মোহতরমা রওশনারা আহমদ সাহেবা দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

**রোকসানা বেগম**
সেক্রেটারী ইশায়াত।

## শুভ বিবাহ

• গত ২০/০২/২০০৮ইং মোছঃ লিয়াহ রহমান, পিতা-মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার, পূর্ব কোমরনই, মিয়া পাড়া, গাইবান্ধ্যা এর সাথে সাইফুল ইসলাম পিতা-মোহাম্মদ হানিফ শালসিড়ি, পঞ্চগড় এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্টেশন নং- ৭০৫/০৮

• গত ০২/০২/২০০৮ইং মোছঃ আয়েশা আক্তার, পিতা-ডাঃ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, সাং রামনগর পোঃ রিকাবী বাজার, মন্সিগঞ্জ এর সাথে মোহাম্মদ এনামুর রহমান আফ্রাদ পিতা-আহমদ হোসেন আফ্রাদ, মল্লিক হাটি, নাটোর এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্টেশন নং- ৭০৬/০৮

• গত ০২/০২/২০০৮ইং মোছঃ ইশরাত জাহান (লিজা) পিতা-মোহাম্মদ মহিউদ্দীন আকন্দ, গ্রাম-বেতাল, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ এর সাথে জনাব ফখরুল ইসলাম (সেতু) পিতা-মোহাম্মদ সিরজুল ইসলাম, গ্রাম-রামনগর রিকাবী বাজার, মুন্সীগঞ্জ এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার)

টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্টেশন নং- ৭০৭/০৮

• গত ০৩/০২/২০০৮ইং মোছঃ মোবারেকা বেগম মনি, পিতা-মরহুম আহসান উল্লাহ পাটোয়ারী, আহমদনগর ধাক্কামারা পঞ্চগড় এর সাথে জনাব মোহাম্মদ শামিম হোসেন, পিতা-মোহাম্মদ মোস্তাজ আলী, সুজানগর (মথুর ডাঙ্গা) এর বিবাহ ৪৫,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্টেশন নং- ৭০৮/০৮

• গত ০৩/০২/২০০৮ইং মোছঃ সাকেরা তাসলীম পিতা-আতাউর রহমান, বাড়ী ১২৪ রোড, ৫ সেকশন-১১ সাংবাদিক আ/এ, এর সাথে জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসাইন, পিতা-জনাব সুলতাম কাজী, কুকুয়া আমতলী বরগুনা এর বিবাহ ১,০০,০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্টেশন নং- ৭০৯/০৮

• গত ০২/০৩/২০০৮ইং মুশিতা পারভীন, পিতা-মোহাম্মদ দাউদ আলী গাজী, গ্রাম+পোঃ যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর সাতক্ষীরা এর সাথে মোহাম্মদ আব্দুল হালীম মোল্ডল, পিতা-শহীদ সোবহান মোল্ডল, গ্রাম+পোঃ যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর সাতক্ষীর এর বিবাহ ১৫,০০১/- (পনের হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্টেশন নং- ৭১০/০৮

• গত ২২/০২/২০০৮ইং মোছঃ সালমা হোসেন, পিতা-মোয়াজ্জেম হোসেন, গ্রাম+পোঃ সখিপুর জেলা-শরীয়তপুর এর সাথে আব্দুল মালেক, পিতা- জনাব আব্দুল খালেক, উত্তর বাহেরচর কেরারনীগঞ্জ এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্টেশন নং- ৭১১/০৮

• গত ০৪/০২/২০০৮ইং মোছঃ জাকিয়া সুলতানা, পিতা-মোহাম্মদ এনামুল হক সরকার, মহারাজপুর, পুরুলিয়া, নাটোর এর সাথে জনাব মোহাম্মদ ইফতেখার আহমদ, পিতা-মোহাম্মদ সাহব উদ্দীন ঘুরী গ্রাম+পোঃ ফাজিলপুর, জেলা-ফেনী এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্টেশন নং- ৭১২/০৮

• গত ১০/০৩/২০০৮ইং মোছঃ মরিয়াম আক্তার পিত-মরহুম হাবীবুর রহমান, গ্রাম+পোঃ নিউসোনাতলা থানা ঃ সারিয়াকান্দি, জেলা ঃ বগুড়া এর সাথে জনাব মোহাম্মদ কামরুনজ্জামান, পিতা-মরহুম শামসুজ্জামান, গ্রাম ঃ শালসিড়ি পোঃ ফুলতলা, থানা ঃ বোদা, জেলা ঃ পঞ্চগড় এর বিবাহ ২৯,১০০/- (উনত্রিশ হাজার একশত) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্টেশন নং- ৭১৩/০৮

• গত ০৭/০৩/২০০৮ইং মোছঃ সানজিদা আক্তার, পিতা-মরহুম শামীম আহমদ, ২৫ বি, ব্লক-ই ১ম কলোনী, মিরপুর বড় বাজার, মিরপুর এর সাথে জনাব মির্যা হাসান আরিফ মাহমুদ, পিতা জুলফিকার হায়দার ইজেল ড্রীন ফ্যাট-এল-৭ সেক্টের-৫ উত্তরা ঢাকা এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্টেশন নং- ৭১৪/০৮

• গত ১৬/০৩/২০০৮ইং মোছঃ সাবিনা আক্তার (শিল্পী), পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, গ্রাম+পোঃ সূর্যনগর, (পশ্চিমপাড়া) বকশীগঞ্জ, জেলা-জামালপুর এর সাথে জনাব বশীর আহমদ, পিতা-মরহুম আনিস আলী দক্ষিণ বীর, উত্তর বীর ধরম বাজার, সুনামগঞ্জ এর বিবাহ ১,২৫,০০০/- (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্টেশন নং- ৭১৫/০৮

• গত ২৯/০২/২০০৮ইং মোছঃ সায়েরা খাতুন (শিউলী), পিতা-আনিসুর রহমান ভূইয়া, গ্রাম+পোঃ ক্রোড়া জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হুদা চঞ্চল, পিতা-মরহুম ঈদুল আজহা গ্রাম+পোঃ শিমরাইল কান্দি পাউয়ার হাউজ রোড (দঃ আহমদীপাড়া), বি বাড়িয়া এর বিবাহ ৪৯,৯৯৯/- (উনপঞ্চাশ হাজার নয় শত নিরানব্বই) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্টেশন নং- ৭১৬/০৮

• গত ১০/০৮/২০০৭ইং মোছঃ মনসুরা বেগম (স্বর্ণা), পিতা-মোহাম্মদ ছলিমুল্লাহ্ নয়াপাড়া, জামালপুর এর সাথে জনাব আহমদ সালমান পার্শী পিতা-মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্ ১৫১/১০ শেওড়া পাড়া ঢাকা এর বিবাহ ১,০০,০০০ (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্টেশন নং- ৭১৭/০৮

• গত ১৫/০৩/২০০৮ইং মোছঃ বন্যা আক্তার পিতা-মোহাম্মদ উমর, কন্দিপাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে শেখ শাহনুর শাহীন, পিতা-শেখ আব্দুল আউয়াল, গঙ্গানগর বাজার এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্টেশন নং- ৭১৮/০৮

• গত ১১/০৫/২০০৮ইং মোছঃ সিমা আক্তার, পিতা-মরহুম আব্দুল মান্নান, ৭৩৮ পশ্চিম কাজিপাড়া, মিরপুর ঢাকা এর সাথে মোহাম্মদ মনির হোসেন, পিতা-মোহাম্মদ ওয়াহিদ মিয়া, গ্রাম+শালসিড়ি পোঃ ফুলতলা, থানা-বোদা জেলা পঞ্চগড় এর বিবাহ ৫০,০০১/– (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা

মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্টেশন নং- ৭১৯/০৮

• গত ০২/০৫/২০০৮ইং মোছঃ আকলিমা পরভীন (শিল্পী) পিতা-আবুল বাসার ঢালী, গ্রাম+পোঃ যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর সাতক্ষীরা এর সাথে মোহাম্মদ ইমরান হোসেন (শামীম) পিতা-মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, মহল্লাঃ শিরইল (শান্তিবাগ) পোঃ ঘোড়ামারা এর বিবাহ ২৫,০০১/- (পঁচিশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্টেশন নং- ৭২০/০৮

*সংশোধনী ঃ গত সংখ্যার ৪২তম পৃষ্ঠায় বিবাহের সংবাদে রেজিষ্ট্রেশন নং ৭০০/০৮ এর তারিখ ২১/১২/০৮ দেয়া হয়েছিল। সঠিক তারিখ হলো ২১/১২/০৭ইং। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর দুঃখিত।*

**রিশ্‌তানাতা দপ্তর**
**আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ।**

**মাহে রমযান উপলক্ষে ফিতরানা ও ফিদিয়া নির্ধারণ**

এ বছর রমযান উপলক্ষে ফিদিয়া ও ফিতরানা নিম্নরূপ ধার্য করা হয়েছে ঃ
**ফিদিয়া –**
শহর অঞ্চলের জন্য –**১২০০/-**
গ্রাম অঞ্চলের জন্য – **৮০০/-**
**ফিতরানা –**
সমগ্র দেশব্যাপী –**৭০/-**
**বিঃ দ্রঃ** ফিতরানা সকল সদস্য এমনকি ঈদের দিন জন্মলাভ করা শিশুর জন্যও আদায় করতে হয়।
**মোহাম্মদ আব্দুল জলিল**
জেনারেল সেক্রেটারী
আমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলদেশ ।

# বিজ্ঞপ্তি

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী ইজতেমা ২০০৮ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। স্মরণিকাটিকে সুসমৃদ্ধ ও স্মরণীয় করে রাখতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি রেখে সকলের নিকট থেকে লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে–

• আপনাদের এলাকার, বিশেষভাবে মজলিসি/জামাআতের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট সহ ছবি পাঠাবেন।
• মজলিস তথা জামাআতের মোখালেফাত ও তবলীগের ক্ষেত্রে ঈমান উদ্দীপক কোন ঘটনা থাকলে তা লিখে পাঠাবেন।
• খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে আপনাদের কোন ছবি (ব্যক্তিগত বা গ্রুপ) যদি থাকে তা (স্থান, কাল, পাত্র ক্যাপশনসহ) পাঠাবেন।
• মরকয থেকে আগত যে কোন বুযুর্গানে-দ্বীনের সাথে আপনাদের কোন ছবি (ব্যক্তিগত বা গ্রুপ) যদি থাকে তা (স্থান, কাল, পাত্র ক্যাপশন সহ ) পাঠাবেন।
• আপনার এলাকায় জামাআত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঈমান উদ্দীপক কোন ঘটনা থাকলে সেই ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য সহকারে লিখে পাঠাবেন (যদি কোন ছবি থাকে পাঠাবেন)।
• এদেশে বা বিদেশে মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বা জামাআত গঠনে ও প্রচার-প্রসারের উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা যদি জানা থাকে তা লিখে পাঠাবেন।
• সকল জেলা ও রিজিওনাল নাযেমগণকে অনূরোধ করা যাচ্ছে যে আপনারা প্রত্যেকে নিজেদের এক কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি টুপি পরিহিত অবস্থায় (নাম ও পদবি সহ) অতিসত্বর কেন্দ্রে পাঠাবেন।

উপরোক্ত বিষয়াদি ছাড়াও খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা, খিলাফতের বরকত, তালীম ও তরবীয়ত প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রবন্ধ এবং কোন বুযুর্গ সম্পর্কে কোন প্রবন্ধ যা স্মরণীয় ও ঈমান উদ্দীপক তা পাঠাবেন। লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ২০ অক্টোবর। প্রাপ্ত লেখা, প্রবন্ধ, ছবি ও তথ্যাদি যত্ন সহকারে সংরক্ষিত করা হবে এবং কমিটির সুপারিশ ও সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের অনুমোদনক্রমে স্মরণীকায় প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

**আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ মোহাম্মদ**

সেক্রেটারী স্মরণিকা কমিটি ২০০৮

মোবাইল ঃ ০১৯১১ ৩৮৯৭০০/ ০১৭১৪ ০৮৫০৭০